ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী
সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ-ব্রাহ্মণ্যবাদের
গুণমুগ্ধদের প্রতি

খোলা চিঠি

হারুনুর রশীদ

ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী
সাম্রাজ্যবাদ,ইহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের,
গুণমুগ্ধদের প্রতি

খোলা চিঠি

হারুনুর রশীদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকঃ
পরিচালক, ইতিহাস পরিষদ,
১৭১,বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশকালঃ
জুন ১৯৯৩
আষাঢ় ১৪০০

প্রচ্ছদ ঃ
হামিদুল ইসলাম

মূল্য ঃ
সাদা-বিশ টাকা মাত্র
নিউজ-তের টাকা মাত্র

মুদ্রকঃ
শহীদ সুলতান প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কেন এই খোলা চিঠি

বিগত দু'শ বছরে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বহু দেশ রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে ; বহুদেশে সাধিত হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লব। এইসব স্বাধীনতা ও বিপ্লবের ইতিহাস নিয়ে পক্ষবিপক্ষ কারু মধ্যেই কোন দ্বিমত দেখা দেয়নি। কারণ বাস্তবে যা ঘটেছে, যা ঘটতে মানুষ দেখেছে,–সেটাই হয়েছে তাদের ইতিহাসের অন্তর্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও জর্জ ওয়াশিংটনের ভূমিকা থেকে শুরু করে, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং বলশেভিক (RSDLP) দল ও লেনিনের ভূমিকা হয়ে সাম্প্রতিক ইরানের বিপ্লব ও ইমাম খোমেনীর ভূমিকা পর্যন্ত কোন স্বাধীনতা ও বিপ্লবের ইতিহাস নিয়েই কারু মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই।

কিন্তু বিশ্বের একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস। স্বাধীনতার ২২ বছর পরও এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর হয়নি ; সম্ভবপর হয়নি আমাদের জাতীয়তাসহ অনেক ইস্যুর স্বরূপ নির্ধারণ।

রক্তমূল্যে অর্জিত বিপ্লব বা স্বাধীনতার মূল্যে যাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন, তাঁদেরই পবিত্র দায়িত্ব দাঁড়ায় মিথ্যাকে সত্য এবং কল্পনাকে বাস্তব বলে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকা। তাহলেই সমস্যার সৃষ্টি হয় না এবং ইতিহাস তার আপন গতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এই নিরপেক্ষতা বজায় থাকেনি বরং মুক্তিযুদ্ধকালীন দুর্বলতা সমূহকে ঢাকতে গিয়ে মুক্তি যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব কুক্ষিগত করা, গোষ্ঠী স্বার্থে দলীয় ও দলীয় নেতার কাল্পনিক মাহাত্ম্য সুপারইম্পোজ করা এবং ক্ষমতা ও গোষ্ঠী স্বার্থকে চিরস্থায়ী করার সন্ত্রাসী প্রবণতার নীচে বস্তুবাদী ও ইতিহাসের সত্য প্রায় সম্পূর্ণরূপেই চাপা পড়ে যায়।

সেদিন যাঁরা তাঁদের কায়েমী স্বার্থ ও কল্পনার ইতিহাসকে জাতির ঘাড়ে জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা আজ রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থাকলেও, তাঁদের সেই ভূমিকা অব্যাহত আছে এবং বর্তমান প্রজন্মের কিছু অংশ হলেও তাঁদের এই তৎপরতার ফলে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এরা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও ইহিহাসকে বিকৃত করেছে। এরা বস্তুতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি, মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণও করেনি, অথচ মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব এককভাবে আত্মসাৎ করতে উদ্যত হয়েছে। এরা জন্মলগ্নেই বাংলাদেশের অর্থনীতি, আইনশৃংখলা ও মূল্যবোধের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশপ্রেম ও জনগণের সোল এজেন্সী দাবী করছে। এরা যে ভয়ংকর এক দলীয় ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারের প্রবর্তন করেছিল, সেটাকেই বলছে মহত্তম গণতন্ত্র।

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজমের ধ্বংসের পর সাম্রাজ্যবাদ–ইহুদীবাদ–ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্তমান আঘাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমান। এরা বাংলাদেশে এই সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদেরই বিশ্বস্ত দোসর হিসাবে কাজ করছে এবং ইসলামের ওপর একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধও ছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের মুক্তির সংগ্রাম। অতএব, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগে ইসলামের দ্বন্দ্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এরা মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামকে পরস্পর বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করছে।

ভারত বাংলাদেশকে তার পণ্যের একচেটিয়া অবৈধ বাজারে পরিণত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পসম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক বিকাশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভারত গঙ্গা–তিস্তা–ব্রহ্মপূত্র সহ প্রতিটি নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করে দিচ্ছে। শান্তিবাহিনী ও বঙ্গসেনা সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে খন্ডবিখন্ড করে দেওয়ার তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। আর এরা ভারতের এই তৎপরতার প্রতিই সর্বাত্মক সমর্থন যোগাচ্ছে।

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস বলেছিলেন, "কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে, আগে সে জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাও।" এই নীতির অনুসরণে সাম্রাজ্যবাদ–ইহুদীবাদ–ব্রাহ্মণ্যবাদ ও তাদের বাংলাদেশী দোসররা মুসলমান অধ্যুষিত এই ভূখন্ডের হাজার বছরের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

১৯৭১–এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের আপামর জনগণ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এই চেতনাবোধ থেকে রুখে দাঁড়িয়েছিল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে রাষ্ট্র পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায় পর্যন্ত শোষণ–বৈষম্যের অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। মুক্তিযোদ্ধারা হয়েছে অবহেলিত–বিড়ম্বিত। ৮৭% মানুষ বাধ্য হচ্ছে দারিদ্রসীমার নীচে মানবেতর জীবন যাপন করতে। ০·৫% মানুষের হাতে পূঞ্জীভূত হয়েছে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৭০%। বেকারত্ব, ঘুষ, দুর্নীতি, খুন–হাইজ্যাক–রাহাজানি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি আজ সর্বকালের সর্ব রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে। অথচ এরা জনগণের দৃষ্টিকে মূল সমস্যা থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নন ইস্যুকে ইস্যু করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছে। এরা শোষণ–বৈষম্যের অবসানের জন্য আন্দোলন করে না, দ্রব্যমূল্য হ্রাস কিংবা বেকারত্ব দূরীকরণের জন্যও আন্দোলন করে না, আন্দোলন করে না গঙ্গা–তিস্তা–ব্রহ্মপূত্রে বাঁধ নির্মাণ কিংবা তালপট্টি দ্বীপ দখলের বিরুদ্ধে, আন্দোলন করে না বিশ্ব ব্যাঙ্ক–আই এম এফ–এর কবল থেকে দেশের অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্বকে মুক্ত

www.pathagar.com

করার লক্ষ্যে। এরা চায় সাম্রাজ্যবাদ-ইহুদীবাদ-ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বার্থে শুধুই নৈরাজ্য, শুধুই অস্থিতিশীলতা। তাইতো এরা পার্লামেন্টের মধ্যে পর্যন্ত সদম্ভে ঘোষণা করে, তারা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'গণ আদালত' ছাড়া অন্য কোন আদালত মানে না।

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী। তিনি তাঁর চিন্তাচেতনার কাঠামোর মধ্যে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। চূড়ান্ত বিচারে দেখা যাবে যে, তাঁর চিন্তা চেতনা ও কর্মকান্ডের মধ্যে বাস্তবিকই কোন স্ববিরোধিতা ছিল না। অথচ এরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ভাবমূর্তিকে তাদের সকল অপকর্মের শিখন্ডি হিসাবে ব্যবহার করছে এবং তিনি যা ছিলেন না ও তিনি যা করেননি,- তাঁর ওপর তাই চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে ইতিহাসের ভাঁড়ে পরিণত করতে চাইছে।

এই চূড়ান্ততম মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি, চক্রান্ত ও নৈরাজ্যের কবল থেকে জাতিকে মুক্ত করতে না পারলে সম্ভব নয় এজাতির সার্বিক মুক্তি, সম্ভব নয় মহান মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনার বাস্তবায়ন, সম্ভব নয় লাখো শহীদের রক্তের ঋণ পরিশোধ।

তাই, দেশ ও জাতির সামনে আজ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার পটভূমি কি ছিল, কার কি অবদান ছিল মুক্তিযুদ্ধে, বিজয়ের পর কে কি ভূমিকা পালন করেছে, কে বা কারা দায়ী দেশ ও জাতির বর্তমান শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার জন্য। স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকদর্শন।

এই লক্ষ্যেই এই খোলা চিঠি।

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন বা উপহাস করার জন্য নয়, কোন গোষ্ঠী স্বার্থে কাউকে ঘায়েল করার লক্ষ্যেও নয়; বরং বিচারপতি এম, আর, কায়ানী যাকে বলেছেন 'অ্যাবসলিউট ট্রুথ' বা নিরংকুশ সত্য,- সেই নিরংকুশ সত্যকে সত্য-মিথ্যার বর্তমান ঘূর্ণাবর্ত থেকে ছেঁকে আলাদা করার লক্ষ্যেই এই খোলা চিঠি।

বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরংকুশ সত্যের মুখোমুখি উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই এই খোলা চিঠি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

।।এক।।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে "সোভারেনটী অব রীজন" বা যুক্তির সার্বভৌমত্ব। এটা যাঁরা মানেননা গোটা সভ্যজগত তাঁদেরকে ঠিক সভ্য বা বিবেকবান বলে বিবেচনা করেনা। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপারটা যেন ঠিক উল্টো। এখানে যিনি যত বেশী যুক্তিবিবর্জিত, অন্ধ ও গোঁড়া, তিনিই যেন ততো বেশী প্রগতিশীল। এজাতীয় প্রগতিশীলদের বিচারে যা কিছুই কালোত্তীর্ণ ও শাশ্বত সে সমস্তই প্রতিক্রিয়াশীল। আর যা কিছুই স্বল্পায়ু, মুমূর্ষু কিংবা ইতিহাসের কবরে প্রোথিত– সে সবই প্রগতিশীল ও আরাধ্য।

বাংলাদেশে যাঁরা প্রগতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদার, তাঁদের মৌল বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ ঃ

ক· অন্ধ ইসলাম বিদ্বেষ

খ· ভারত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্মকান্ডের প্রতি অন্ধ অনুরাগ

গ· মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার একচ্ছত্র ধারক–বাহক হিসাবে নিজেদের জাহির

ঘ· ১৬·১২·৭২ থেকে ১৫·৮·৭৫ পর্যন্ত সময়কে বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ বলে প্রচার

ঙ· যাবতীয় কর্মকান্ডের বর্ম হিসাবে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংগালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ও ভাবমূর্তিকে ব্যবহার।

এধরনের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বদ্ধমূল–সগর্ব ধারণাটা হলো নিম্নরূপ ঃ

১· বিশ্বের একমাত্র মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও বর্জনীয় বিষয় হলো ইসলাম। সদাসর্বত্র বিরাজমান একক সর্বময় শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস অবৈজ্ঞানিক, মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল। হস্তীমূখ বা দশভুজা দেবদেবীর উপাসনাও সে তুলনায় প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিক সুষমামন্ডিত।

২· মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি বেশ্যাদের খদ্দের আহবানের সমতুল্য (বলেছেন কবি শামসুর রাহমান) দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আযান অসহ্য (বলেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী)। মোহাম্মদ তুখোড় বদমাষ– চোখেমুখে রাজনীতি (দাউদ হায়দারের কবিতা)। আমাদের উচিত রবীন্দ্রনাথের এবাদৎ করা (বলেছেন কবি সুফিয়া কামাল)। বেহেশত নারীদের কাংখিত হওয়ার কথা নয়, বেহেশতে নারীদের শারীরিক ও মানসিক সুখের কোন ব্যবস্থা নেই (তসলিমা নাসরীন,যায় যায় দিন, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা)। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার মতো "অপকর্ম" করায় তসলিমা নাসরীন তাঁর আপন গর্ভধারিনী মাকেও কঠোর ভাষায় গালাগাল করেছেন। "মূর্খতা ও

www.pathagar.com

মুসলমানিত্ব অভিন্নার্থক। যেই লোকই জ্ঞানী, সেই লোকই নাস্তিক। পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম নেই, যা আস্তিকেরা করেনি। যে কোন আস্তিকের চেয়ে একজন নাস্তিক সব সময়েই ভালো। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম টিকে আছে শুধুমাত্র ইতর ও অজ্ঞানদের মধ্যে। এরা কোন কিছু বুঝার চেষ্টা না করে ইসলামকে টিকিয়ে রেখেছে। ৭২ সালে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্মের অস্তিত্বহীনতা" (ডঃ আহমদ শরীফ বলেছেন, ২১ শে অক্টোবর ১৯৯২, স্বদেশ চিন্তা সংঘ আয়োজিত সেমিনারে। এই সেমিনারে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর, হায়দার আকবর খান রনো, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নেত্রী হামিদা বানু প্রমূখও ইসলামের বিরুদ্ধে খুবই বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন।) ডঃ আহমদ শরীফ অবশ্য ১৯৭৭-সালে প্রকাশিত তাঁর "যুগযন্ত্রণা" শীর্ষক গ্রন্থেও নিজেকে নাস্তিক বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে একই ধরনের হুবহু বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৮৫ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারেও ডঃ আহমদ শরীফ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "আমি আস্তিক্যে বিশ্বাস করি না।" (১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'কবি মতিয়ুর রহমান খান পঞ্চম স্মারক বক্তৃতা'তেও ডঃ আহমদ শরীফ তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহর আসলে কোন অস্তিত্বই নেই, এবং ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ প্রকৃতপ্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট ধর্ম প্রবর্তকদের নিছক শয়তানি মাত্র)।

৩· কুরআন হাদীস-এর যে সমস্ত জায়গায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা এবং জিহাদ (আর্থাৎ কুফর শির্ক-বিদআত এবং শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম)-এর কথা বলা হয়েছে, সেসব অংশ কোন মসজিদে পড়া যাবেনা; সেগুলোর ব্যাখ্যা বা তফসিরের তো কোন প্রশ্নই উঠে না (এঁদের মতে সর্বোত্তম হলো মসজিদ মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া)।

৪· এদেশে মার্কস, লেনিন, মাও, বাতিস্তা, রুশো, ভল্টেয়ার, ম্যাকিয়াভেলি, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনী, গোল্ডা মায়ার, আইজ্যাক র‍্যাবিন, সিংম্যান রী, বুশ, ক্লিনটন, ইন্দিরাগান্ধী, নরসিমা রাও, আদভানী, বল থ্যাকারে প্রমূখ যে কারো আদর্শ ও মত-পথ অনুসরণে কোন বাধা নেই। এদেশে শুধু একজনেরই জীবনাদর্শ ও মত-পথ অনুসরণ করা যাবে না, -তিনি হলেন মুহম্মদ (দঃ)। কুরআন-সুন্নাহর আদর্শকে এদেশে বরদাস্তই করা যাবে না। আর 'ইতর' লোকেরা যদি নিতান্তই কুরআন সুন্নাহর চর্চা করতেই চায়, তবে তা করতে হবে, প্রগতিশীল'- ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী। প্রসংগত; উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের ঐক্য সংক্রান্ত একটি আয়াত সংসদে তেলওয়াতের অপরাধে জনাব আ·

www.pathagar.com

স· ম· ফিরোজ ও অপর একজন আওয়ামী লীগ এম, পি· সংশ্লিষ্ট মাওলানাকে কাঠোরভাবে শাসিয়ে দেন (১৯৯২)।

৫· রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর অনুসরণে, যারা টুপি-দাঁড়ি রাখবে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কথা বলবে অথবা ভারত বা ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করবে তারা সব রাজাকার-আলবদর, এমনকি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও। এই হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম, এ জলিলও ছিলেন একজন ঘৃণ্য রাজাকার; কারণ তিনি ভারতীয় লুটপাটের মতো একটি 'প্রগতিশীল' কাজের বিরোধিতা করেছিলেন এবং শেষ জীবনে কুরআন সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কথা বলেছিলেন।

৬· রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন করে "স্যাটানিক ভার্সেস" লেখা সলমন রুশদীর গণতান্ত্রিক অধিকার। ইসলামের ওপর যথেচ্ছ আঘাত হানাও আহমদ শরীফ-তাসলিমা নাসরীনদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু এদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা বা বিপরীত মত পোষণ করা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। এক কথায় নাস্তিকতা, ইসলাম বিরোধিতা ও ভারত-ভক্তি গণতান্ত্রিক; এর বিপরীত সব কিছু অগণতান্ত্রিক ও রাজাকারী। কুরআন - সুন্নাহর প্রতি যাঁর ঘৃণা যতো বেশী, তিনিই ততবড়ো দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চিন্তাচেতনার ধারক।

৭· ১৯৭১-এর ঘটনাবলীর জন্য ইয়াহিয়া-ভুট্টোর হঠকারিতা কিংবা বঙ্গবন্ধুর দলীয় নেতাদের নিশ্চেষ্টতা ও পরিকল্পনাহীনতা ইত্যাদি আদৌ দায়ী নয়। ৭১-এর যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ইসলামপন্থীরা, বিশেষত; অধ্যাপক গোলাম আযম।

৮· দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ঘুষ-দুর্নীতি, খুন-হাইজ্যাক-রাহাজানি, আইন-শৃংখলার ক্রমবিলুপ্তি, কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৬৭% এর বেকারত্ব, ৮৭% মানুষের দারিদ্র্যসীমার নীচে মানবেতর জীবন যাপন, আকাশচুম্বি শোষণ-বৈষম্য ইত্যাদি আসলে কোন সমস্যাই নয়। বাংলাদেশের একমাত্র সমস্যা হলো কুরআন-সুন্নাহর চর্চা ও অধ্যাপক গোলামআযম।

৯· তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত যতো গোলাগুলী -বোমাবাজি-খুন-খারাবি হচ্ছে, তার সবই আসলে জামাত-শিবির-যুব কমান্ডেরই কাজ। যেমন, গত ২৪ শে জানুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে শেখ হাসিনার দলেরই দু'গ্রুপ প্রকাশ্যে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে- এক পর্যায়ে দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরী দু'গ্রুপের মাঝখানে বসে থেকে পরিস্থিতি শান্ত করারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বয়ং শেখ হাসিনা ও হাজার হাজার মানুষ যা নিজ চোখে দেখেছেন, তা আসলে সত্য নয়। সত্য হলো, এই ঘটনার জন্যও

www.pathagar.com

আসলে দায়ী জামাত-শিবির। ঠিক তেমনি রাশেদ খান মেনন ও রতন সেনের আততায়ীরা নিজেরা অপরাধ স্বীকার করলেও, তারা আসলে অপরাধী নয়; জামাত-শিবিরই হলো আসল অপরাধী।

১০· গত ৪৬ বছরে ভারতে প্রায়১৩,৯০৫ টি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে; কাশ্মীরে পাইকারী মুসলিম নিধন ও নারী নির্যাতন চলছে। ৭১-৭২ সালে ভারত যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়েছে, পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করেছে, বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে তার বুকের ওপর রামমন্দির নির্মাণ করেছে, তালপট্টি দ্বীপ দখল করেছে, গঙ্গা-তিস্তায় বাঁধ দিয়েছে এবং ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ নির্মাণের আয়োজন সম্পন্ন করেছে। ভারত শান্তিবাহিনী ও বঙ্গ-ভূমি ওয়ালাদের লালন করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে খন্ডবিখন্ড করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ভারতের লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা প্রতিটি ইসলামী নাম ও শব্দকে সযত্নে বিকৃত করে চলেছেন (যেমন, সুরাবর্দী, সুকর্ন, সেখ মজিবর, মহম্মদ, জিনত আমন, অমজদ আলী, রোশেনারা, সাহালাম, নেমাজ, আভা বসুরচিত উপন্যাস 'জহন্নম থেকে জন্নত', বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস 'খাঁ ইতিবরের রোজনামচা' ইত্যাদি।) উপরোক্ত সমস্ত কাজই হলো প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতিটি সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক মানুষের পবিত্র কর্তব্য হলো ভারত ও ভারতীয়দের এরূপ যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করা। আর যারা ভারত ও ভারতীয়দের উপরোক্ত 'প্রগতিশীল' কাজসমূহের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে, তারা নিঃসন্দেহে 'প্রতিক্রিয়াশীল', মৌলবাদী ও রাজাকার আলবদর।

১১· একথা সবাইকে মানতেই হবে যে, বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বসত্ব একমাত্র তাঁর দলেরই নেতা-কর্মীদের। একথাও সবাইকে মানতে হবে যে, বিজয় দিবস থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত সময়টাই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, এসময়ে জনগণের সুখসমৃদ্ধির কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না এবং গণতন্ত্রও ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবাধ। বলাবাহুল্য, এটা যারা মানবে না, তারা অবশ্যই ঘৃণ্য রাজাকার আলবদর।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশে এখন যাঁরা প্রগতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছেন এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে লিপ্ত হয়েছেন এঁদের মধ্যে সমাজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অনুসারীদের এক অভূতপূর্ব মধুসম্মিলন ঘটেছে; এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন লেনিন-মাও ভক্ত, তেমনি রয়েছেন ক্লিনটন-নরসীমা-আদভানী-বল থ্যাকারেদের ভক্তও।

www.pathagar.com

একটা নিরপেক্ষ ও বস্তুনির্ভর জরীপ চালালে দেখা যাবে যে, উপরোক্ত ধারণা ও দৃষ্টিভংগী যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ–ইহুদীবাদ–ব্রাহ্মণ্যবাদেরই করুণা ও অনুকম্পানির্ভর; চূড়ান্ত বিচারে ঘুষ–জুয়া–চোরাকারবারী– মুনাফাখোরী এবং দেশের স্বার্থ বিক্রয়লব্ধ প্রিমিয়ামের এঁরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বেনিফিশিয়ারী এবং প্রগতির নামাবলীর আড়ালে এঁরাই মদ–গাঁজা–হেরোইন, এইড্‌স–সিফিলিস, সলিড গোল্ড–অ্যাবা–সেক্স অ্যাপীল, হাউজি – বিউটি পার্লার–ব্লু ফিল্ম ইত্যাদির মূল বোদ্ধা, ভোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। এসবই তাঁদের চিন্তা চেতনা ও প্রেরণার মৌল উৎস।

অথচ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে এর সব কটাই বন্ধ হয়ে যাবে এবং ফলে এঁদের অনেকের জীবনই হয়ে পড়বে রসহীন–বর্ণহীন–বৈচিত্রহীন। ইন্দোনেশিয়া থেকে বোসনিয়া–হার্জেগোভীনা এবং কাজাকস্তান থেকে সেনেগাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিশ্বজুড়ে আজ ইসলামের যে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছে, তাতে প্রগতিবাদী–নাস্তিকতাবাদীরা যে অনেকখানি ভীতসন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়বেন, তাতেও বিস্ময়ের কিছুই নেই।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০% হলো ধর্মপ্রাণ মুসলমান। এদেশে গত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ চর্চিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সুবিধাতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি আপামর জনগণকে ক্রমবর্ধমান শোষণ, দুর্নীতি, দারিদ্র্য, বৈষম্য, প্রবঞ্চনা, হতাশা ও অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। এমতাবস্থায়, মানুষ যে ক্রমশঃ একমাত্র বিকল্প ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে থাকবে, এটাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।

সম্ভবতঃ এই ইসলাম –আতংক থেকেই তথাকথিত প্রগতিবাদী–ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা (অর্থাৎ ধর্মহীনতাবাদীরা) যত্রতত্র জামাতে ইসলামীর প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। চেতন বা অবচেতন মনে তাঁদের মনমগজে সম্ভবতঃ এটাই ক্রিয়া করছে যে, জামায়াতে ইসলামীই যেহেতু এদেশের সবচেয়ে সংগঠিত ও বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন, সেহেতু এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েমের ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ভূমিকাই হবে মুখ্য ও নিয়ামক। প্রগতিবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা হয়তো এটাও বিশ্বাস করেন যে, ছলে–বলে–কৌশলে জামায়াতে ইসলামীকে একবার হীনবল করে দিতে পারলেই দেশের বাদবাকী অসংগঠিত বা কম সংগঠিত ইসলামী শক্তিসমূহকে নির্মূল করে দিতে তাঁদের তেমন কোন বেগ পেতে হবে না। মনে হয়, এ কারণেই এঁদের বর্তমান আঘাতের মুল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এই লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যেই তাঁরা সজ্ঞানে ও সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন নন ইস্যুকে ইস্যু করে তুলছেন এবং লাগাতার গেয়েই চলেছেন যে, ১৯৭১ ও

www.pathagar.com

তৎপরবর্তী যাবতীয় সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের জন্য এই সংগঠনই দায়ী। এজন্যই তাঁরা গোয়েবলসীয় কায়দায় বর্তমান প্রজন্মের মনমগজে একথা ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন যে, যাঁরাই টুপি-দাঁড়ি রাখেন, নামায-কলেমা পড়েন, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েমের কথা বলেন-তাঁরা সব ঢালাওভাবে রাজাকার-আলবদর। এটাও ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, প্রগতিবাদী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মূল লক্ষ্য আসলে অধ্যাপক গোলাম আযম নয়, মূল লক্ষ্য ইসলাম। ইসলামকে ধ্বংস করাই তাঁদের ব্রত। অধ্যাপক গোলাম আযম উপলক্ষ মাত্র।

ভারতে অনুষ্ঠিত মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গা, মসজিদ-মাযার ধ্বংস, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ড, শান্তিবাহিনী ও বঙ্গসেনাদের তৎপরতা, ক্রমবর্ধমান শোষণ-বৈষম্য ও দরিদ্রায়ন ইত্যাদি থেকে বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টি ও মনযোগকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করাও সম্ভবতঃ নন ইস্যুকে ইস্যু করার অন্যতম কারণ।

ইসলাম-বিরোধী রাজনীতির অংগনে, দেশের বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষায়তনে এবং গণপ্রচার মাধ্যমসমূহে এইসব প্রগতিবাদী-নাস্তিকতাবাদীদের সীমিত অথচ সুসংগঠিত অবস্থান থাকায়, তাঁরা তাঁদের ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডা, মিটিং, মিছিল, তথাকথিত গণআদালত ইত্যাদির কাজ অনায়াসেই চালিয়ে যেতে সমর্থ হচ্ছেন এবং তরুণ সমাজের কিয়দংশকে কিছু সময়ের জন্য হলেও প্রভাবিত করতে পারছেন।

বস্তুতঃ, ঘটনাপ্রবাহ আজ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশে ইসলাম থাকবে নাকি ধর্মহীনতা থাকবে, বাংলাদেশ কি ভারতের সেবাদাসত্ব করবে নাকি সত্যিকার স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে, শোষিত-নিপীড়িত জনগণের সার্বিক মুক্তি অর্জিত হবে নাকি শোষণ বৈষম্য দুর্নীতির রাজত্বই কায়েম থাকবে, মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে নাকি মহান মুক্তিযুদ্ধের নাম ভাঙিয়ে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের খেলাই বলবৎ থাকবে- এসব বিষয়ে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

।।দুই।।

প্রগতিবাদী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুক্তিযুদ্ধের সর্বস্বত্বের দাবীদার মহোদয়রা! আপনারা তো সব সময়েই বলেন, বিজ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কথা, জনতার কথা এবং সত্যিকার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার কথা। তাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্বার্থে, আপামর জনগণের সার্বিক মুক্তির স্বার্থে, মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ ইতিহাসের স্বার্থে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও

www.pathagar.com

ইসলামপন্থী উভয়ের স্বরূপ জনতার আদালতে তুলে ধরার স্বার্থে – নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ আপনাদের সামনে সবিনয়ে উপস্থাপন করছিঃ

১· প্রগতির অর্থ অগ্রগতি। সুতরাং যে মতবাদ বিজ্ঞান–প্রযুক্তির বিকাশ এবং তজ্জনিত কারণে সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম, সেটাকেই বলা যায়, প্রগতিশীল। আর যে মতবাদ এব্যাপারে অক্ষম, সে মতবাদই প্রতিক্রিয়াশীল। এতোদিন দাবী করা হতো যে, মার্কসবাদ–লেনিনবাদের অনুসারীরাই প্রগতিশীল। কিন্তু আজ বাংলাদেশে সাবেক ও ম্রিয়মান সমাজবাদীরা পুঁজিবাদ–সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাদের মধ্যেই ভিড়ে বসে আছেন এবং সমাজবাদ–ধনবাদকে একাকার করে দিয়েছেন। সমাজবাদী–সাম্রাজ্যবাদীরা আজ গলাগলি করে আওয়াজ তুলছেন যে, তাঁরাই প্রগতিশীল এবং একমাত্র ইসলামই হলো মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল। যে মতবাদ ৭০ বছরও টিকলো না, সেই মতবাদ আপনাদের মতে প্রগতিশীল; আর যে মতবাদ ১৪০০ বছরেরও বেশী সময় যাবৎ অবিকৃতভাবে টিকে রইলো–সেটাকেই আপনারা বলছেন প্রতিক্রিয়াশীল। এখন বলুন, আপনাদের বিচারে প্রগতির সংজ্ঞা কি? যে মতবাদ ১৪০০ বছরেরও বেশী সময় যাবৎ টিকে আছে সেটা কেন কোন যুক্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল?

২· আরও লক্ষণীয় যে আপনারা, বাংলাদেশের প্রগতিবাদী – ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা, একাধারে গর্বাচেভ–ইয়েলৎসিন, বুশ–ক্লিনটন, ইন্দিরা নরসিমা রাও এবং আদভানী–বল থ্যাকারের অনুসারী। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আপনারা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব–স্বামী বিবেকানন্দ–রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের অন্ধভক্ত। অথচ মার্কসীয় বস্তুবাদী বিচারে এঁরা আদৌ প্রগতিশীল বা ধর্মনিরপেক্ষ কিনা সন্দেহ। তাহলে, ইসলাম–এর বিরোধিতাই কি প্রগতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র লক্ষণ?

৩· ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির এক বছর আগে। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ২৯ বছরের মধ্যেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে। কিন্তু এই উপমহাদেশের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা? প্রতি বছর খন্ডবিখন্ড হওয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে "সাম্রাজ্যবাদের পা–চাটা কুকুর" জাতীয় গালাগাল করা ছাড়া তাঁরা আর কোন অবদানই রাখতে সমর্থ হননি।একমাত্র জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বিপ্লবী ফ্রন্ট ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য একটি দুঃসাহসী, সংগ্রামী ও সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু একটি মাত্র টেকনিক্যাল ভুল, অর্থাৎ জিয়াউর রহমানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বধানে নিয়ে আসার ব্যাপারটি খেয়াল না করার দরুন তাঁদের এই সঠিক উদ্যোগটি ভেস্তে যায়। তাঁরা যদি সেদিন জিয়াকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে

www.pathagar.com

নিয়ে আসতেন, যা খুবই সম্ভবপর ছিল, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসই ভিন্ন হয়ে যেতো। পরবর্তীতে এই ভুলকে সামাল দেওয়ার জন্য তাঁরা ২৭ নভেম্বর কাউন্টার ক্যু-এর উদ্যোগ নেন, যার ফলশ্রুতিতে কর্নেল আবু তাহের বীরোত্তম-এর ফাঁসি হয়; ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে অপহরণের চেষ্টা করেন, সেনাবাহিনীর অফিসার হত্যাকে শ্রেণীসংগ্রামের অংশ বলে অভিহিত করেন এবং একের পর এক ভুলের মাধ্যমে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে পড়েন)। এ দেশের প্রগতিবাদীদের ৭০ বছরের ইতিহাস নিলে দেখা যাবে যে, এঁরা ছিলেন আসলে বুলিসর্বস্ব প্রগতিশীল। সংগ্রামী মার্কসবাদী নন। বলুন, আপনাদের এই শান্তিনিকেতনী প্রগতিবাদ এদেশের মানুষকে ৭০ বছরে কি দিয়েছে? আজ বাংলাদেশে যে কজন অবক্ষয়িত বা প্রায় অবক্ষয়িত সমাজবাদী অবশিষ্ট রয়েছেন তাঁরাও তো আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বর্জন করে বুশ-ক্লিনটনীয় মুক্ত অর্থনীতি-তথা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসত্বের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। এই কি প্রগতির নমুনা? আপনাদের বিগত ৭০ বছরের ভূমিকাই কি প্রগতিশীল ছিল, নাকি বর্তমান ভূমিকা?

৪· বাংলাদেশের মানুষ ২৪ বছরে দু'বার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, যা বিশ্বের ইতিহাসে কোন জাতি কোনদিন পারেনি। প্রথমবারের স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানও ছিল অপরিসীম (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান আন্দোলনও মূলতঃ কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছিল না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও ছিলেন না এমন কোন গোঁড়া ধর্মপরায়ন মানুষ। বস্তুতঃ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিচালিত ঐক্যপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেসের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যই মুসলমানেরা ১৯৩৭-৪০ সালে সর্বপ্রথম আলাদা রাষ্ট্রের কথা ভাবতে বাধ্য হয়)। যাইই হোক, হুবহু লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তান কায়েম করা না গেলেও, বঙ্গবন্ধুরা ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান কায়েম করেন, তারই ভৌগোলিক কাঠামো থেকে ১৯৭১ সালে বেরিয়ে আসে বর্তমান বাংলাদেশের কাঠামো। অথচ, আপনারা বলছেন পাকিস্তানের জন্মটাই ভুল ছিল। তাহলে আপনারা কি বলতে চান, পাকিস্তান আন্দোলন করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নেতা -সহযোগীরা ভুল করেছিলেন? লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তানেরও তো মূলে ছিল ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্ব। সেটাও কি আপনাদের কাছে গ্রহণীয় ছিল? হলে, কোন যুক্তিতে? আপনারাইতো বলেন, জনগণ কখনোই ভুল করে না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের গণভোটে বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে এতো বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়েছিল, যা সেকান্দর হায়াত খানের মতো জাঁদরেল নেতার নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাবেও সম্ভবপর হয়নি। আপনারা কি তাহলে বলতে চান, ১৯৪৬ সালে বাংলাদেশের জনগণ ভুল করেছিল? জনগণও ভুল করে? সেদিন যদি বঙ্গবন্ধুরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের

www.pathagar.com

বিনিময়ে পাকিস্তান কায়েম না করতেন, তাহলে বর্তমান বাংলাদেশ আজ বঙ্গ প্রদেশের অংশ হিসাবে ভারতেরই অন্তর্ভূক্ত থাকতো। সেক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করা কি আপনাদের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হতো? হলে, তা কিভাবে হতো? মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, হরিয়ানা, কেরালার অভিজ্ঞতা আপনাদের কি শিক্ষা দেয়? অবশ্য একথা ঠিক, বাংলাদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলে, নেহরু-ইন্দরা- মোরারজী দেশাই-নরসিমা রাওদের রাজত্বে বসে, আদভানী-বাল থ্যাকারেদের সরাসরি পদানত থেকে শিব ও শিবাজীর সেবা-স্তুতি অনায়াসেই করা যেতো। কিন্তু সেই সুযোগ থেকে তো আপনাদের বঞ্চিত করেছেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নেতা- সহযোগিরা। এই বাস্তবতার আলোকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আপনাদের কি মূল্যায়ন? কি কি সুবিধা হতো আপনাদের-১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত হলে?

৫· ১৯৪৭ সাল পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনই ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে থেকে স্বৈরাচারের অবসান কিংবা প্রাদেশিক দাবী আদায়ের আন্দোলন। ৬ দফাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রুহুল কুদ্দুস ৬-দফা প্রণয়ন করেন (আইয়ুব খান কর্তৃক পদচ্যুত আমলা রুহুল কুদ্দুসকে যুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব নিয়োগ করা হয়, কিন্তু বঙ্গবন্ধুই আবার তাঁকে দুর্নীতির দায়ে পদচ্যুত করতে বাধ্য হন)। যাইহ হোক, এই ৬ দফাই ছিল বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ততম আদর্শ, তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের ম্যাগনাকার্টা। এই ৬-দফার ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ -এর ঐতিহাসিক নির্বাচন। ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এই ৬ দফার ওপরই ছিলেন অবিচল। কিন্তু ৬-দফায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয় তো দূরের কথা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ কিংবা দরিদ্র জনগণের শোষণ ও দারিদ্র মুক্তির ব্যাপারেও একটি শব্দমাত্র ছিল না। বস্তুতঃ, ৬-দফা ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই অবাংগালী পুঁজিপতি ও আমলাদের সংগে এঁটে-উঠতে-না-পারা পূর্ব পাকিস্তানী উঠতি পুঁজিপতি ও আমলাদেরই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দলিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে যিনি সর্বপ্রথম স্বাধীন-বাংলাদেশের চিন্তাভাবনা করেন, তাঁর নাম বিচারপতি ইব্রাহীম। তৎকালীন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হিসাবে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী সংবিধানে (১৯৬২) দস্তখত করতে অস্বীকার করার দরুন আইয়ুব খান বিচারপতি ইব্রাহীমকে বরখাস্ত করেন। এই বিচারপতি ইব্রাহীমেরই উদ্যোগে এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই তরুণদের যে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তারই অন্যতম সদস্য ছিলেন সিরাজুল আলম খাঁন, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী ও অন্যান্যেরা। এরপর সশস্ত্র উপায়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রথম উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন পাকিস্তান নেভীর কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং তাঁর দুঃসাহসী সহযোদ্ধরা। চট্টগ্রামের বিভূতি ভূষণ চৌধূরী (মানিক চৌধুরী) ও ডাঃ

www.pathagar.com

সৈয়দুর রহমান (উভয়েই আওয়ামী লীগ সদস্য) এই উদ্যোগের সংগে জড়িত ছিলেন। এই উদ্যোগ ফাঁস হয়ে গেলে শুরু হয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলায় আইয়ুবশাহী বঙ্গবন্ধুকেও অনাহূত ফাঁসিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ২৮ শে জানুয়ারী সামরিক ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দানকালে স্পষ্টভাষায় বলেন, "এই–আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এক্স কর্পোরাল আমির হোসেন, এল, এস, সুলতান উদ্দিন আহমদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের কখনো দেখি নাই। —ইহা অসম্ভব যে, একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী, একজন সাধারণ এল, এম, এফ, ডাক্তার সৈয়দুর রহমানকে আমি কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি।—আমি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, ইহা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম—আমি কখনো এমন কিছু করি নাই বা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে স্থল, নেভী বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই। আমি নির্দোষ এবং এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না" (বঙ্গবন্ধুঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আবীর আহাদ, পৃষ্ঠা–৫৮–৫৯)। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মামলার ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর সামনে এক মহানায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন এবং আইয়ুব শাহীর মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে। রাজনীতির মঞ্চ থেকে স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কিন্তু, এইসব উদ্যোগকে স্বীকার করলে স্বাধীন বাংলাদেশ –এর কৃতিত্বের সিংহভাগই বিচারপতি ইব্রাহীম, কমান্ডার মোয়াজ্জেম, মাওলানা ভাসানী প্রমুখকে দিয়ে দিতে হয় বিধায় আপনারা এব্যাপারে কোনদিনই উচ্চবাচ্য করেননি, আজও করেন না। আপনারা যাঁরা স্বাধীনতার 'সত্যিকার' ইতিহাস রচনা করতে চান, তাঁরা কি ঘুণাক্ষরেও এঁদের নাম উচ্চারণ করেন? শহীদ মোয়াজ্জেমের পরিবার –পরিজনের সামান্য খবরটুকু নেওয়ার গরজও কি কোনদিন অনুভব করেন? এইই কি আপনাদের যথার্থ ইতিহাস নিষ্ঠার প্রমাণ?

৬· আপনারাতো তারস্বরে দাবী করে আসছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আপনাদেরই একক কৃতিত্ব। যদি তাই হয়, তাহলে বলুন তো আওয়ামী লীগের কোন প্রকাশ্য বা গোপন বৈঠকে স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল? কারা উপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে? বাস্তবতা হলো এই যে, এরকম কোন সিদ্ধান্তই কখনো গ্রহণ করা হয়নি। বরং ২৮/২/৭১ তারিখে গভর্নমেন্ট হাউসে

www.pathagar.com

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন গভর্ণরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে বলেছিলেন, "আমার অবস্থা হলো–দু'পাশে আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবাহিনী আমাকে মেরে ফেলবে। নয় আমার দলের চরমপন্থীরা আমাকে হত্যা করবে। কেন আপনারা আমাকে গ্রেফতার করছেন না? টেলিফোন করলেই আমি চলে আসবো" (নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, মেজর সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা–৫৬)। ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, "বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না, রক্তপাত ও উৎপীড়ন ছাড়া। ----আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বায়ত্বশাসনের জন্য" (পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিড লোসাক, পৃষ্ঠা–৭১–৭২)। বঙ্গবন্ধুর এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া কি?

৭· মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা যদি আপনাদের পূর্বপরিকল্পিত হয়েই থাকে, তাহলে তো পাকিস্তানী হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়ুক আর নাইই পড়ুক, আপনারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতেনই। প্রশ্ন হলো, হানাদাররা ঝাঁপিয়ে না পড়লে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করবেন বলে আপনারা সাব্যস্ত করেছিলেন? দলিল প্রমাণসহ তা হাজির করতে পারবেন কি?

৮· ১৯৭১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিস্থ সেনাবাহিনী সদর দফতরে জেনারেল আবদুল হামিদ, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল গুল হাসান, জেনারেল টিক্কা খান, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান এস, এ, সউদ প্রমূখের উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর কঠোর হামলা চালানো হবে। কৌশল হিসাবে ওরা সাব্যস্ত করে যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারীদের আলোচনায় ব্যস্ত রেখে, সৈন্য ডেপ্লয়মেন্ট ও ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। সেই অনুযায়ী যুদ্ধজাহাজ 'সোয়াত' প্রভৃতিকে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়। আপনারা এসব খবর আদৌ জানতেন কি? জানলে এর প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? যে কোন যুদ্ধ শুরুরই অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য পূর্ব–কাজ হলো যুদ্ধের ষ্ট্র্যাটেজী, ট্যাকটিকস, ষ্ট্রাইকিং ফোর্স, সাপোর্টিং ফোর্স, কমান্ড ষ্ট্রাকচার, চেইন অব কমান্ড এবং গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল, পশ্চাৎভূমি ইত্যাদি নির্ধারণ করা। এগুলোকেই বলা হয় পরিকল্পনা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বা তাঁর দল কি আদৌ কোন ষ্ট্র্যাটেজী বা কমান্ড ষ্ট্রাকচার নির্ধারণ করেছিলেন? কখনোই করেননি। এসবের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পরিকল্পিত বলে দাবী করা কি নিতান্তই অর্বাচীন ছেলেমানুষী নয়?

৯· ২৫ শে মার্চ রাত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন বলেই যদি বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকনে, তাহলে ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে সমবেত শতশত

www.pathagar.com

দেশীবিদেশী সাংবদিকের সামনে কেন ঘোষণা করলেন যে, পরবর্তী কর্মসূচী হলো ২৭ শে মার্চ দেশব্যাপী হরতাল? এর অর্থ কি? কেন রাত সাড়ে দশটার সময় বঙ্গবন্ধু ডঃ কামাল হোসেনের কাছে ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন পরদিন (২৬ শে মার্চ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংগে বৈঠকে বসার জন্য (ডঃ কামাল হোসেন লিখিত প্রবন্ধ, দি ডেইলী নিউজ, ২৬ শে মার্চ, ১৯৮৭ সংখ্যা)? এই ব্যগ্রতা কি একথাই প্রমাণ করে না যে, মাত্র ৬০ মিনিট পর কি ঘটতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কোন ধারণাই ছিল না? তিনি আদৌ জানতেন না যে ক্র্যাক ডাউনের নির্দেশ দিয়ে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদ পাড়ি জমিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুই যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ওই কালরাতে বাড়ীতে বসে থাকলেন কি যুক্তিতে? পৃথিবীর কোন দেশের কোন কালের কোন বিপ্লব বা মুক্তিযুদ্ধের নেতা কি এইভাবে এই যুক্তিতে বীভৎস শত্রুর হাতে ধরা দেওয়ার জন্য আপন শোয়ার ঘরে বসেছিলেন? স্বাধীনতা ঘোষণার ফলশ্রুতি কি হতে পারে, এব্যাপারে তাহলে কি তাঁর কোন ধারণাই ছিল না? কেন হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বঙ্গবন্ধুর দলের নেতারা সব পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং উদভ্রান্তের মতো যে যখন পারলেন, যেভাবে পারলেন, যে পথে পারলেন– তখন সেভাবে সে পথে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ভারতে গিয়ে উঠলেন? ১৯৯২ এর বিজয় দিবসে লিখিত বেগম জোহরা তাজউদ্দিনের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং তাজউদ্দিন আহমদও অন্যান্য সহকর্মী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনরকমে ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন। কেন? কেন ইন্দিরা গান্ধী তিক্ত ক্ষোভের সংগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে বলেছিলেন, "তূ–ভারতে কে কবে শুনেছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ করে সেনাপতি শত্রুপক্ষের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়? আপনারা প্রথমে বলেছিলেন তিনি (বঙ্গবন্ধু) ২৫ শে মার্চ রাত্রেই গৃহত্যাগ করেছেন এবং সহসাই আপনাদের সংগে মিলিত হবেন। এখন দেখা গেল আপনাদের সেকথা ঠিক নয়। এটা যুদ্ধের কোন ধরনের কৌশল আমাকে বুঝিয়ে বলুন" (ঢাকা–আগরতলা–মুজিবনগর, এম, এ, মোহাইমেন, পৃষ্ঠা–৬৪)? কেন আওয়ামী লীগের অতি ঘনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ–কূটনীতিবিদ কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর "স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় ও অতঃপর" গ্রন্থে লিখলেন, "আওয়ামী লীগের নেতারা এমনিভাবে দেশত্যাগ করায় এটাই পরিষ্কার হয়েছিল যে, এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য শেখ সাহেব বা আওয়ামী লীগের কোন প্রস্তুতি বা পরিকল্পনাই ছিল না" (পৃষ্ঠা–১২১)? বাস্তব সত্য কি এই নয় যে, বঙ্গবন্ধুর বা তাঁর দলের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কোন পরিকল্পনাই ছিল না এবং কোন ধারণাই ছিল না ইয়াহিয়া খাঁর 'অপারেশন সার্চ লাইট' সম্পর্কে?

১০· বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি পূর্ব পরিকল্পিত হয়েই থাকে, তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি, মূদ্রানীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, বাণিজ্যনীতি, প্রশাসন,

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির রূপ কি হবে তার আদৌ কোন নীলনক্সা প্রণয়ন করা হয়েছিল কি? হয়নি। বস্তুতঃ ৬-দফা ভিত্তিক ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহার ছাড়া আওয়ামী লীগের অপর কোন সংজ্ঞায়িত সামাজিক বা অর্থনৈতিক কর্মসূচীই ছিল না (বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, পৃষ্ঠা-১৮)। আসলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কথা বলতে আদৌ রাজী ছিলেন না। সিরাজুল আলম খান ও তাঁর সহযোগিরা বঙ্গবন্ধুর ওপর এ ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করলে, তিনি ৬ই মার্চ দিবাগত রাত ২টার সময় তৎকালীন জি· ও· সি· মেজর জেনারেল খাঁদিম হোসেন রাজার কাছে বিশেষ দূত মারফত এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে চাপের মধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে। তাদেরকে উপেক্ষা করার শক্তি তাঁর নেই। অতএব তাঁকে যেন সেই রাত্রেই সেনাবাহিনীর হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয় (নিয়াজীর আত্ম সমর্পণের দলিল, মেজর সিদ্দিক সালিক, পৃষ্ঠা-৬৪)। জি· ও· সি· বঙ্গবন্ধুর এই আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় অনন্যোপায় বঙ্গবন্ধুকে পরদিন (৭ই মার্চ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে উগ্রপন্থী তরুণদের শান্ত করার জন্য এটুকু বলতেই হয় যে, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এটাই কি প্রকৃত সত্য নয়?

১১· যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ পূর্বপরিকল্পিত ছিল না, সেহেতু এব্যাপারে ভারতের সংগে তেমন কোন পূর্ব ব্যবস্থাও ছিল না। বঙ্গবন্ধুর যোগাযোগ ছিল শুধুমাত্র তাঁরই দলের সংসদ সদস্য, কোলকাতার ২১ নং রাজেন্দ্র রোডে বসবাসরত চিত্তরঞ্জন সুতার-এর সংগে। বস্তুতঃ তখন দুই বৈরী শক্তি চীন ও পাকিস্তানের চাপে ভারতের রীতিমত নাভিশ্বাস উঠছিল। এমতাবস্থায়, এক বৈরী শক্তিকে খণ্ডিত-হীনবল করার অচিন্তনীয় সুযোগ যখন 'ভগবানের আশীর্বাদ'-এর মতো এসেই গেল, ভারত স্বভাবতঃই সে সুযোগ লুফে নিল। ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ক্র্যাক ডাউনের পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, "ঈশ্বরপ্রদত্ত এই সুযোগকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না" (দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ, মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং, পৃষ্ঠা-১৮)। সেদিন ভারত যদি তার জন্মশত্রু পাকিস্তানের খণ্ডন ও বিপর্যয় না চাইতো এবং আপন ভূমি ত্যাগী বাঙালীদের তাৎক্ষণিক আশ্রয়, অস্ত্র ও ট্রেনিং না দিত, তাহলে ওই রকম প্রস্তুতিহীনতা, প্রথম আঘাতেই নেতা কর্মীদের পরস্পর ছিটকে পড়া, কোন চেইন অব কমান্ড বা কমান্ড স্ট্রাকচার না থাকা এবং সর্বোপরি মূলনেতা বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে অবস্থান ইত্যাদির বাস্তব পরিণতি কি দাঁড়াতো? ভারতের আশ্রয়, অস্ত্র ও ট্রেনিং না পেলে আপনারা কিভাবে পাকিস্তানী হানাদারদের ঠেকাতেন? হানাদারদের ক্র্যাকডাউনের পর আপনাদের হাল অবস্থা কি প্রমাণ করে?"

www.pathagar.com

১২· একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে, বঙ্গবন্ধু যখন পশ্চিম পাকিস্তানে, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনবরত ঘোষণা দেওয়া হচ্ছিল "বঙ্গবন্ধু আমাদের সাথে আছেন; বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন" ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া ভূট্টো-চক্র অনায়াসেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে, এর সমস্ত দায়দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে পারতো। ইয়াহিয়া-ভূট্টো চক্র যদি বাস্তবিকই মনে করতো যে বঙ্গবন্ধুই মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক-রূপকার এবং পাকিস্তান-ভাঙার মূল হোতা, তাহলে তারা কি এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করে ছাড়তো? কেউ কি কখনো এমন সুযোগ ছাড়ে? যখন পাকিস্তানী হানাদাররা মুটে-মজুর-রিক্সাওয়ালা নির্বিশেষে যে কোন বাঙালীকে দেখামাত্রই হত্যা করছিল, ঠিক তখনই তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ধানমন্ডির অপর একটি বাড়ীতে সরিয়ে নিয়ে পরম যত্নে-সমাদরে রাখলো কেন? হানাদারেরা তাঁদের গায়ে একটা ফুলের টোকাও দিল না কেন? এসবের পেছনে কি কোনই রহস্য নেই?

১৩· একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার একচ্ছত্র দাবীদার সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সদস্য, কোন এম· এন· এ·, কোন এম· সি· এ· এমনকি কোন জেলা কমিটির কোন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকও মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেননি (উক্ত দলীয় যশোরের এম· এন· এ মসিউর রহমানই একমাত্র প্রাণ দিয়েছিলেন বটে,- কিন্তু সেটাও হানাদারদের সংগে সম্মুখ যুদ্ধে নয়)। শহীদদের একমাত্র পরিচয়- সন্ধানী শিমুল মোস্তফা তাঁর দীর্ঘ গবেষণা ও সরজমিনে তদন্ত থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের শ্রেণী বিভাগ নিম্নরূপঃ ছাত্র ৮৶, কৃষক ২০৶, শ্রমিক ১৪৶, চাকুরিজীবী ১৩৶, ব্যবসায়ী ১০৶, গৃহবধূ ১৪৶, শিক্ষক ইত্যাদি ৩৶, অন্যান্য ১৭৶ (একাত্তুরের বধ্যভূমির সন্ধানে, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা- ৯৩, পৃষ্ঠা- ২১)। লক্ষ্যনীয় এখানে শহীদ রাজনীতিবিদদের সংখ্যা শূণ্য। এর কারণ কি? এঁদের সকলেই কি অতুলনীয় অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন? নাকি আসলে এঁরা যুদ্ধের ময়দানের ধারে কাছেও কখনো যাননি? মোট কথা, বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত তরুণ-যুবক-প্রৌঢ়রা যখন হানাদারদের বিরুদ্ধে বিশ্ব ইতিহাসের এক অসম সাহসী যুদ্ধে লিপ্ত ও অকাতরে প্রাণদান রত, তখন এসমস্ত নেতা- এম· এন· এ·- এম· সি· এ-রা প্রকৃত যুদ্ধের ময়দান থেকে অনেক দূরে, কোলকাতা-আগরতলা-দেরাদুন-দিল্লীতে বসে জীবন যৌবনকে উপভোগ করছিলেন, -এটাই কি কঠোর সত্যি নয়?

১৪· হানাদারদের বর্বর হামলার পর ভারতে পালিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে আপনারা বিভিন্ন ব্যাংকের লকার ভেঙে ৮২ কোটি টাকা (বর্তমান মূদ্রামান অনুযায়ী ১৬০০

www.pathagar.com

কোটি টাকার উর্ধ্বে) ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন (বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, পৃষ্ঠা–১৫ দ্রষ্টব্য)। এই টাকার কোন হিসাব আপনারা দিতে পারবেন কি? এই টাকা কারা কিভাবে খরচ করেছিল?

১৫· যেইই করুক, যে কারণেই করুক, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা নিঃসন্দেহে একটি অতি জঘন্য কাজ। অবশ্য, যে কোন হত্যাই অতীব জঘন্য ও ঘৃণার্হ। এটা মেনে নিয়েই জানতে ইচ্ছে করে, ১৯৭১ সালে, বিশেষতঃ ১৪ ই ডিসেম্বর তারিখে যেসব বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা কি মুক্তিযুদ্ধে আদৌ অংশগ্রহণ করেছিলেন? মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের কার কি অবদান ছিল? নাকি, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে আদৌ অংশগ্রহণ করেননি? বরং এই ঢাকা শহরেই নিজ নিজ বাসাবাড়ীতেই পরম নিশ্চিন্তমনে বসেছিলেন? মুনীর চৌধুরী (যিনি বাঙালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য আইয়ুব খানের আমলে গঠিত ব্যুরো অব ন্যাশন্যাল রিকন্সট্রাকশান বা বি, এন, আর–এর পূর্ব পাকিস্তান শাখারও প্রধান ছিলেন) –সহ এসব বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছিলেন না? স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, পাকিস্তানী হানাদারদের সংগে যোগসাজস না থাকলে এইসব বুদ্ধিজীবীরা ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা শহরেরই নিজ নিজ বাসা বাড়ীতে বসবাস করছিলেন কিভাবে? কি ভরসায়? পরাজয়ের মুহূর্তে এইসব বুদ্ধিজীবীরা প্রাণ দিয়ে ন্যাক্কারজনক হানাদার– নির্ভরতার প্রায়শ্চিত্তই করে গিয়েছিলেন, এটাই কি মর্মান্তিক সত্যি নয়?

১৬· একাত্তুরের ১৪ই ডিসেম্বরের দিকে ঢাকা শহরে কি রাজাকার আলবদরদের সত্যিই কোন কার্যকরিতা ছিল? আসলে কারা হত্যা করেছিল স্ব স্ব গৃহে অবস্থানকারী এসব বুদ্ধিজীবীদের? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠতম সমর্থক বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী জন ষ্টোনহাউজ এই সময়ে সশরীরে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১–এর ২১ শে ডিসেম্বর আকাশবাণী, কোলকাতা কেন্দ্রে প্রদত্ত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জন ষ্টোনহাউজ বলেন যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে পাকিস্তানী সৈন্যেরাই যে জড়িত তাঁর কাছে তার প্রমাণ আছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের সংগে জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে জেনারেল পদমর্যাদার দশজন পাকিস্তানী অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে এব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যও তিনি জোর দাবী উত্থাপন করেন। কেন এই তদন্ত অনুষ্ঠান করা হয়নি? কেন এবং কারা সংশ্লিষ্ট সামরিক অফিসারদের বিমানযোগে কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল? জন ষ্টোনহাউজ তো আপনাদেরই লোক। তাঁর বক্তব্য ও দাবী কি মিথ্যে ছিল? নিহত বুদ্ধিজীবীদের পরিবার পরিজনের চাপে পরবর্তীকালে যে তদন্ত কমিশন (দেশীয়) গঠন করা হয়েছিল,

www.pathagar.com

তার রিপোর্টই বা প্রকাশ করা হলো না কেন? তখনতো বঙ্গবন্ধুর দলই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তখন এই রিপোর্ট ধামাচাপা দিল কারা? কি উদ্দেশ্যে? কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে, সেই ভয়ে? রাজাকার–আলবদররা যদি সত্যিসত্যিই এর জন্য দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে তখনই তাদের বিচার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হলো না কেন? যুদ্ধের পর পরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং শাস্তিইতো স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু কেন, কোন্ সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সমস্ত ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে রাখা হলো? এই ব্যর্থতা কাদের? কারা এর জন্য দায়ী?

১৭· জহির রায়হান নিখোঁজ হন ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে। কোলকাতায় অবস্থানকালীন সময়ে, তিনি স্বাধীনতার একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদার দলটির নেতা– এম, এন, এ, – এম, সি, এ,–দের তাস– জুয়া– মদ্যপান– নারী সম্ভোগ অধ্যুষিত জীবনধারার প্রামাণ্য চিত্র তুলে এনেছিলেন। এই জহির রায়হানকে কারা হত্যা করলো? তখনতো দেশে রাজাকার আলবদরের নাম গন্ধও ছিল না। তাঁকে হত্যা করার মধ্যে কাদের স্বার্থ নিহিত ছিল? তাঁর তোলা ছবির রীলগুলোই বা গেল কোথায়? সেগুলো কারা লুকালো? কেন লুকালো?

১৮· একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ যদি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তানী জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করলো কেন? কেন মুক্তি বাহিনীর চীফ অব স্টাফ এম, এ, জি, ওসমানী বা অন্য কোন বাঙালী কর্তৃপক্ষের কাছে নয়? কেন আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশের কাউকে সাক্ষী হিসাবেও রাখা হলো না? কেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেওয়া হলো বিজয়ের এক সপ্তাহ পর, –২২ শে ডিসেম্বর তারিখে? এইসব ঘটনা কি মুক্তিযুদ্ধের ওপর বঙ্গবন্ধুর দলের কর্তৃত্ব প্রমাণ করে? প্রমাণ করে আপনাদের মুখ্য ভূমিকা? আসলে এসবই কি দিল্লীতে সম্পাদিত বিশ্বইতিহাসের ঘৃণ্যতম ৭–দফা চুক্তির ফলাফল নয়;– যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সংগে সংগেই সৈয়দ নজরুল মুর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন? (চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে প্রদত্ত)।

১৯· আপনাদের কি স্মরণ আছে যে, ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বরের পরপরই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর এক এক জন অফিসারকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল। এই সময়ের মধ্যে পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, ওদের লুট করা সোনা–দানা, চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে যুদ্ধের ৯ মাসে জমে–ওঠা বিশাল পরিমাণ আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রী, ইলেক্ট্রনিক্স ও যন্ত্রপাতি–সহ অন্ততঃ

www.pathagar.com

৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভারতে পাচার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভারতীয়দের মতেই এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে লুটে নেওয়া সম্পদের পরিমাণ ২০০ কোটি ডলার (যার বর্তমান মূল্য ৪০ হাজার কোটি টাকা) –এর কম হবে না (কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "অনীক", ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৮১)। এছাড়াও প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী ভারতে পাচার করা হয়েছিল (জনতার মুখপত্র, ডিসেম্বর-১,১৯৭৫)। এই লুটপাট কি আপনারা আনন্দ ও ভক্তিবিগলিত চিত্তে অবলোকন করেননি? এখনো পর্যন্ত কি আপনারা এই লুণ্ঠনের স্বপক্ষে স্তুতি গাইছেন না? এই লুণ্ঠনে বাধা দেওয়ার অপরাধে, বাংলাদেশের সম্পদ বাংলাদেশে রাখতে চাওয়ার অপরাধে আপনারা কি নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর, এম, এ, জলিলকে কারারুদ্ধ করেননি? অন্য সকল সেক্টর কমান্ডার ও ফোর্স অধিনায়কদের 'বীরোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করলেও, ওই অপরাধে আপনারা কি মেজর জলিলকে সর্বপ্রকার খেতাব ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করেননি? এই ঘটনাবলী কি একথাই প্রমাণ করে না যে, আপনারা,– মুক্তিযুদ্ধের সর্বসত্বের দাবীদাররা ভারতীয় লুটপাটের একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রত্যক্ষ দোসর ছিলেন এবং আজো আছেন?

২০· মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং, মেজর জেনারেল লছমন সিং ও মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান-সহ বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় সামরিক অফিসার ১৯৭১–এর ঘটনাবলীর ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীই পাকিস্তানী হানাদারদের পরাজিত করে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা 'উপহার' দিয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থেই বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে কঠোর ও বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মানুষ মূলতঃ ভারতীয় সৈন্যদের কুলি ও পথপ্রদর্শক হিসাবেই অবদান রেখেছিল। কিছুদিন আগে কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ আসলে ভারতীয়দেরই অবদান, "তবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নামে কিছু 'গপ্পো' চালু আছে"। ১৩৯৯ সালের শারদীয় সংখ্যা "দেশ" এ বিখ্যাত সাংবাদিক নীরদ সি· চৌধুরী বাংলাদেশকে "তথাকথিত বাংলাদেশ" বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় জেনারেল, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের এসব দাবী ও বক্তব্য সম্পর্কে আপনারা, –স্বাধীনতা প্রগতি ধর্মনিরপেক্ষতার একচ্ছত্র দাবীদাররা একটি শব্দও কখনো উচ্চারণ করেননি। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আপনারাও বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসলে ভারতীয়দেরই অবদান? এজন্যই কি আপনাদের অন্ধ ভারতভক্তি?

২১· পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠী ২৪ বছর যাবৎ তৎকালীন

www.pathagar.com

পূর্বপাকিস্তানের ওপর যে উপনিবেশিক শোষণ-বৈষম্য চাপিয়ে দিয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতেই এদেশের আপামর জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জমাট বেঁধে উঠেছিল। এই পটভূমিতে ইয়াহিয়া-ভূট্টোর ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা, ৭০-এর নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগের হাতে পাকিস্তানের তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে উদ্ভূত অচলাবস্থা, কিছু সংখ্যক ছাত্র ও যুবনেতার উদ্যোগ এবং ২রা ও ৩রা মার্চ যথাক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও ইশতেহার পাঠের ফলে অবস্থার গুণগত পরিবর্তন, চাপে পড়ে হলেও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত জনগণের ওপর পাকিস্তানী হানাদারদের অতর্কিত হামলা, হানাদারদের বেপরোয়া গণহত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ, এই বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আপামর জনগণের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যাওয়া, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের বাঙালী অফিসার ও জওয়ানদের অসম সাহস ও আত্মত্যাগ, লাখোলাখো কৃষক-শ্রমিক- তরুণ-ছাত্র-জনতার অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মাহুতি এবং পাকিস্তানকে ভাঙা ও হীনবল করার স্বার্থে ভারতের সর্বাত্মক সহায়তা এবং অবশেষে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, মাঝখানে ভারতের অবস্থানের দরুণ পাকিস্তানের সাপ্লাই লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতিতেই মুক্তিযুদ্ধ এভাবে সংঘটিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বস্তুতঃ কোন দল বা ব্যক্তির সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা নয়, বরং ঘটনা প্রবাহই হানাদারদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল বাংলাদেশের সমগ্র জনগণ থেকে। হানাদাররা লিপ্ত হয়েছিল একটা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে। আর, একটা জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে পৃথিবীর কোন শক্তিই কোনদিন জয়ী হতে পারে না। পাকিস্তানী হানাদাররাও পারেনি। এককথায়, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পেছনে সুচিন্তিত উদ্যোগ ও পরিকল্পনার তুলনায় প্রেক্ষিত ও ঘটনা পরম্পরারই অবদান ছিল সর্বাধিক। এই বাস্তব সত্যকে আপনারা কি অস্বীকার করেন? এই কি আপনাদের "সত্যিকার" ইতিহাস-নিষ্ঠার প্রমাণ?

২২. আপনারা দাবী করছেন যে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিলেন। এই হিসাব যদি সঠিক হয়, তাহলে প্রত্যেক বৃহত্তর জেলায় গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার জন এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্ততঃ ৬০০/৭০০ জন মানুষ শহীদ হওয়ার কথা। অথচ আপনাদের দলেরই সাবেক এম, সি, এ, জনাব এম, এ, মোহাইমেন লিখেছেন যে, তাঁরা বহু চেষ্টা করেও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার (অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার) সর্বমোট শহীদের সংখ্যাকে সাড়ে সাত হাজারের ওপরে নিতে পারেননি। অথচ আগরতলার অত্যন্ত নিকটবর্তী হওয়া এবং সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন এই এলাকাতেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সর্বাধিক। তবু, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, অন্যান্য বৃহত্তর জেলায়ও গড়ে ওই পরিমাণ মানুষই শহীদ হয়েছেন, তাহলেও মোট শহীদের

www.pathagar.com

সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩০ হাজারের কাছাকাছি। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগের একনিষ্ঠ ভক্ত–মুক্তিযুদ্ধ কালীন "চরমপত্র"–এর লেখক ও পাঠক এম· আর· আখতার মুকুল পর্যন্ত তাঁর "আমি বিজয় দেখেছি" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, ৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ২ (দুই) লক্ষের মতো। অথচ আপনারা বলেছেন এই সংখ্যা ৩০ লক্ষ। যদি সত্যিসত্যিই তাইই হয়, তাহলে এই ৩০ লক্ষ শহীদের তালিকা আপনাদের কাছে আছে কি? কোন তালিকাই যদি করা হয়ে না থাকে,তাহলে–কম নয়, বেশী নয়, ঠিক ৩০ লক্ষ এই সংখ্যাটি আপনারা পেলেন কোথায়? স্বাধীনতার পর তো আপনারাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন। কেন আপনারা শহীদদের কোন তালিকা তৈরী করলেন না? যদি করতেন তাহলে তো শহীদদের সংখ্যা নিয়েও কোন বিভ্রাট হতো না, শহীদ পরিবারদের পূনর্বাসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াও সহজতর হতো এবং হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রজন্ম জানতে পারতো, কাদের প্রাণের মূল্যে অর্জিত হয়েছে তাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ। আসল কথা কি এই নয় যে, ১৯৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারী সাংবাদিক ডেভিড ফ্রষ্টকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম শহীদের সংখ্যা ৩ লাখ বলতে গিয়ে ইংরেজীতে তিন মিলিয়ন শব্দটি বলে ফেলেন। এরপর আপনারাও আর পূর্বাপর চিন্তা না করে ওই সংখ্যাটিই বলতে থাকেন? আপনাদের এই ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে, জনগণের আবেগকে সংকীর্ণ দলীয় বা গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য আপনারা মহান শহীদ ও পবিত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েও যে কোন দায়িত্বহীন গল্প ফাঁদতে দ্বিধা করেন না? এরূপ মিথ্যাচার কি প্রকৃত শহীদদের প্রতি অবমাননামূলক নয়? আপনাদের বিবেকবুদ্ধি কি বলে?

২৩· ১৯৭১–এর ২৬ শে মার্চ পর্যন্ত পৃথিবীতে "মুজিববাদ" বলে কোন শব্দের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং বা তাঁর দল বা কোন ভক্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত কখনো কোথাও "মুজিববাদ"–এর কথা বলেননি। বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানে, তখনই ১৯৭১–এর মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করে ভারতে তিন স্তম্ভ নিয়ে মুজিববাদের জন্ম হয়ে গেল। বিজয়ের পর আর এক স্তম্ভ লাগিয়ে মোট চার স্তম্ভ করা হলো। বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু উপাধিদানকারী -- তোফায়েল আহমদ ১৭/২/৭২ তরিখে ঘোষণা করলেন "লিঙ্কনীয় গণতন্ত্র এবং মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ই হলো মুজিববাদ"। লিংকনীয় বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শনের বিচারে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। অথচ এই দু'টোকেই জুড়ে দেওয়া হলো মুজিববাদের মধ্যে (সম্ভবতঃ, মুজিববাদের উদ্ভাবকেরা জানতেনই না যে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কিন্তু দু'টো শব্দই তাঁদের কাছে মুখরোচক মনে হওয়ায়, বাস্তবতা চিন্তা না করেই দু'টোকে

www.pathagar.com

একত্রে জুড়ে দিয়েছিলেন। মুজিববাদের উদ্ভাবকেরা সম্ভবতঃ এটাও জানতেন না যে, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য অপরিহার্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ক্যাডার ও নেতৃত্ব; অথচ আওয়ামী লীগ ছিল একটি পেটি বুর্জোয়া সংগঠন এবং মার্কসীয় বিচারে এর নেতা কর্মীদের চরিত্র ছিল সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল, ফলে এরূপ নেতৃত্বের পক্ষে সমাজতন্ত্র কায়েম কখনোই সম্ভপর ছিল না)। এখন প্রশ্ন হলো, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে, তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কে বা কারা 'মুজিববাদ' আবিস্কার করলো? কি উদ্দেশ্যে করলো? মার্কসবাদ এসেছে মার্কস লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে; একইভাবে এসেছে লেনিনবাদ, মাওবাদ, নাৎসীবাদ ইত্যাদি। কিন্তু বিশ্বে একমাত্র মুজিববাদই এসেছে- যাঁর নামে "বাদ" তাঁর অজ্ঞাতে এবং তাঁর লিখিত কোন দর্শনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে। অন্যের মাধ্যমে আসা "বাদ" মুজিববাদ হয় কি করে? আজ সেই মুজিববাদের অবস্থান ও পরিণতিই বা কি? আপনারা কি আজো আপনাদের সেই সোনার পাথরবাটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একই সংগে কায়েম করতে চান? এরকম একটা উদ্ভট বাদ সরলপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনারা কি সত্যিই তাঁকে মহৎ করেছেন? নাকি তাঁকে খেলো ও হেয় প্রতিপন্ন করেছেন? এ অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে?

২৪ একাত্তুরের ২৬ শে মার্চ আপনারা যে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা ও বিশৃংখলার পরিচয় দিয়েছিলেন, বিজয়ের পরও ঘটালেন ঠিক একই কাণ্ড। আতাউল গনি ওসমানী ও স্বরাষ্ট্র সচিব তসলিম উদ্দিন আহমদ স্বাক্ষরিত মুক্তিযুদ্ধের সনদ বা সার্টিফিকেটসমূহ যত্রতত্র যাকে তাকে টোটকা ঔষধের বিজ্ঞাপনের মতোই বিলি করে দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট দিস্তা বা শ' হিসাবে বিক্রি হতেও দেখা গেল যেখানে সেখানে। আপনারাই তো মুক্তিযুদ্ধের 'মহান ধারক-বাহক'। কেন আপনারা সেদিন এভাবে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা সবাইকে একাকার করে দিয়েছিলেন? এটা কি আপনাদের মহত্ব? নাকি সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নির্মম পরিহাস? নিজেরা বাস্তবিকই অস্ত্র হাতে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেননি বলেই আপনারা এই কান্ডজ্ঞানহীন কাজ করতে পেরেছিলেন, এটাই কি সত্যি নয়? রাষ্ট্র ক্ষমতার সাড়ে ৩ বছরে আপনারা বেপরোয়া ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ করতে পারলেন, হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যাও করতে পারলেন, অথচ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটা তালিকা তৈরী করতে পারলেন না কেন? রাজাকার আলবদরদের আপনারা গাল দেন। কিন্তু আপনারা যারা এসব কান্ড-কীর্তন করেছেন, তারা রাজাকার-আলবদরদের তুলনায় কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর? কি দায়িত্ব আপনারা পালন করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি? কেন বেকার ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের আজো বাঁচার দাবীতে অনশন ধর্মঘট করতে হয়? কারা দায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের এই পরিণতির জন্য?

www.pathagar.com

২৫· পৃথিবীতে সর্বদেশে সর্বকালে যাঁরাই বিপ্লব সাধন করেছেন, তাঁরাই পুরানো প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামো পাল্টে বিপ্লবের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন কাঠামো প্রবর্তন করেছেন (স্ব স্ব ধরনের বিপ্লবের স্বার্থে লেনিন–মাও সেতুঙ যেমন জার বা চিয়াং কাইশেক–এর প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামো রাখেননি, ইমাম খোমিনীও তেমনি রাখেননি শাহ–এর আমলের কোন কাঠামো। কিম ইল স্যুং, ফিডেল ক্যাস্ট্রো, মুয়ামার গাদ্দাফী, সাদ্দাম হোসেন–সকলের ব্যাপারেই একই কথা)। সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর যে ক্ষমতা ও ইমেজ ছিল, তা গোড়াতে লেনিন–মাও কারুরই ছিল না। তখন যদি উপনিবেশিক সমস্ত কাঠামোকে তুলে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়েও দেওয়া হতো, তাহলেও টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করার মতো বুকের পাটা এদেশের কারুরই হতো না। কিন্তু এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিজয় অর্জনের পর করা হলোটা কি? সেই বৃটিশ এবং পাকিস্তানী আমলের উপনিবেশিক প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামোকেই হুবহু বহাল রাখা হলো। বহাল রাখা হলো একই ব্যক্তিবর্গকে। এখন যাকে স্বৈরাচারী বলে অষ্টপ্রহর গাল পাড়া হচ্ছে, তখন সেই হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদকেও দেরাদুনে পাঠিয়ে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে এনে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বহাল করা হয়েছিল। আর যারা জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, পৃথিবীর বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছিল, সেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন–কাঠামো কিংবা দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আত্মস্থ বা ইনস্টিটিউশানলাইজ করা হলো না। তাদের অনেকেরই স্টেনগান ধরা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো ব্রীফকেস আর মদের বোতল; আমদানী লাইসেন্স আর লুটের বখরা। আর বাদবাকী বিশাল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধারা যে কোথায় গেল, জীবিকার কোন উপায়ই তারা করতে পারলো কি পারলোনা, তার কোন খোঁজই আপনারা নিলেন না। আপনারাই তো মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র ধারক–বাহক। আপনারা জবাব দিন, পৃথিবীতে কবে কোন দেশে এ ধরনের কান্ড ঘটেছে? কেন আপনারা উপনিবেশিক কাঠামোসমূহকে ভাঙার বদলে আরও মজবুত করলেন? কেন মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সংগে আত্মস্থ ও পুনর্বাসিত করলেন না? মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, লক্ষ লক্ষ শহীদ এবং বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের প্রতি এর চেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা কি আর কিছু হতে পারে?

২৬· আপনারাতো মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সমস্ত অবদান বঙ্গবন্ধুর ও তাঁর দলের ওপর আরোপ করেই চলেছেন। অথচ, এব্যাপারে, বঙ্গবন্ধুর একান্ত ঘনিষ্ঠ, আওয়ামীলীগ দলীয় সাবেক এম, সি, এ, জনাব এম, এ, মোহাইমেন বলেছেন, "সেপ্টেম্বর–অক্টোবর, এমন কি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শেখ সাহেব মুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

যদি আমাদের ডাক দিয়ে বলতেন, আমার ছয় দফা দাবী পাকিস্তান সরকার মেনে নিয়েছে, তাই তোমরা সবাই ঢাকা চলে আসো, -তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে (ভারত থেকে) ঢাকা চলে আসতো" (ঢাকা-আগরতলা-মুজিবনগর, পৃষ্ঠা-১২৭)। তিনি আরও বলেছেন, "তাজউদ্দিন কর্তৃক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন করে দেশ স্বাধীন করাকে শেখ সাহেব সন্তুষ্টির সংগে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল ২৫ শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী যে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল, কিছু ছাত্রজনতা হত্যার মারফত সাময়িকভাবে হলেও তারা অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এক বছর কি দেড় বছর পরে হলেও জাগ্রত জনতার আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার করে তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করে পারবে না। কিন্তু তাঁর সে হিসাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাজউদ্দিন যে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশ স্বাধীন করে ফেলতে পারবে, এটা তিনি (শেখ মুজিব) কল্পনাই করতে পারেননি। ..... দেশে প্রত্যাবর্তনের পর, তাঁর গ্রেফতার হওয়ার পরে দেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছিল, সে সময়ে কে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কার অবদান কতটুকু ছিল,- এ সম্পর্কে তিনি কোনদিন কোন খবরই জানতে চাননি। এ ব্যাপারে কখনো কোন আলোচনাও হতে দেননি। বাহাত্তুরের দশই জানুয়ারী থেকে পঁচাত্তরের পনরই আগষ্ট পর্যন্ত রেডিও-টেলিভিশন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একাত্তুরের পঁচিশে মার্চ থেকে বাহাত্তুরের নয়ই জানুয়ারী পর্যন্ত সময়টুকু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা হয়ে আসছিল, কারণ ওই সময়ে তিনি (শেখ মুজিব) ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত .....। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর '৭৫ সনে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত সতরই এপ্রিল, যেদিন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কুষ্টিয়ার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেছিল, সে তারিখটি চারবার এসেছিল। ... কিন্তু শেখ সাহেবের জীবিতকালে ঐ স্থানে তিনি নিজে তো কোনদিন যানইনি, এমনকি পার্টির কাউকে যেতেও দেননি। ঐ দিনকে স্মরণ করে কোন আলোচনা অনুষ্ঠানও হতে দেননি" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫)। এ প্রসংগে ৬-দফার প্রণেতা ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুস বলেছেন, "তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) অবর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করেননি, কি কষ্ট আমরা করেছি অথবা কি যন্ত্রণা আমরা সয়েছি কিংবা যুদ্ধ করেছি কিভাবে" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সি আই এ, মাহমুদুল হক, পৃষ্ঠা-৯৮)। রুহুল কুদ্দুস আরও বলেছেন যে, অথচ এই বঙ্গবন্ধুই "পাকিস্তানের জেল থেকে দেশে ফিরেই ক্যান্টনমেন্টে চলে যান পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮)। কেন ৮ই জানুয়ারী ১৯৭২

www.pathagar.com

রাত ৩টার সময় স্বয়ং জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় সম্বধানা জ্ঞাপন করেন? বলাবাহুল্য, এর আগেও দু'বার বঙ্গবন্ধু-ভুট্টো বৈঠক হয়। ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে ফরাসী সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালাসীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো বলেন, "লণ্ডন হয়ে ঢাকা ফেরার আগে আমি দু'বার তাঁর সংগে দেখা করি। তিনি (বঙ্গবন্ধু) কুরআন স্পর্শ করে শপথ নেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে সম্পর্ক রাখবেন" (ইন্টারভিউ উইথ হিষ্ট্রি, ওরিয়ানা ফ্যালাসী, পৃঃ ১৯৭)। বঙ্গবন্ধু একথার কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেননি। উপরন্তু লন্ডনের হোটেলে সাংবাদিক এন্থনী ম্যাসকারাহানসকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আপনার জন্য একটা দারুণ খবর আছে। এখনো কেউ জানে না খবরটি। আমরা পাকিস্তনের সংগে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক রাখতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না এ নিয়ে অন্য সবার সংগে কথা বলছি ততক্ষণ এর বেশী কিছু বলতে পারবো না। দোহাই আল্লাহর। তার আগে কিছু লিখবেন না। (লিগেসী অব ব্লাড, এন্থনী ম্যাসকারাহানস, পৃঃ ৫)। এরই বা অর্থ কি? এটাইবা পাকিস্তানের প্রতি বঙ্গবন্ধুর কি মনোভাব প্রকাশ করে? এ প্রসংগে আরও লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৭২ সালের ২১-২৩ শে জুলাই দ্বিধাবিভক্ত মুজিববাদী ছাত্রলীগের দু'অংশ দু'টি সম্মেলন আহবান করে। একটি আহ্বান করেছিলেন প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারী আ, স, ম, আবদুর রব, স্বাধীনতার প্রথম ইশতেহার পাঠকারী শাজাহান সিরাজ প্রমূখ। উভয় সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধুকে প্রধান অতিথি করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারী ও ইশতেহার পাঠকারীদের সম্মেলনে যাননি; তিনি গিয়েছিলেন অপর সম্মেলনটিতে। উপরোক্ত ঘটনাসমূহ কি প্রমাণ করে? কেন বঙ্গবন্ধু সেই বিভীষিকাময় নয় মাসের কথা জানতে চাইতেন না? কেন তাঁর শাসনকালে মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা রেডিও-টেলিভিশনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? কেন পাকিস্তান থেকে ফিরেই তিনি ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে গিয়েছিলেন? কেন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমি মুজিবনগরে নিজেও কোনদিন যাননি, অন্য কাউকে যেতেও দেননি? কেন বঙ্গবন্ধু লণ্ডনে ম্যাসকারাহানসের কাছে এরকম মন্তব্য করেছিলেন? বঙ্গবন্ধু কি আসলেই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? নাকি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা? পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার? কেন আপনারা বঙ্গবন্ধু যা ছিলেন না, তাঁর ওপর তাইই চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের যথার্থ অবদান সমূহকেও বিতর্কিত করে তুলেছেন?

২৭. তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঙ্গার বলেছিলেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যখন ইতিহাস লেখা হবে, তখন প্রমাণিত হবে যে, মার্কিন নীতি এবং আমাদের স্থানীয় কর্মতৎপরতাই শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রেখেছে" (এন্ডারসন পেপারস,

www.pathagar.com

জ্যাক এন্ডারসন, পৃষ্ঠা–২৭৬)। হেনরী কিসিঙ্গারের বক্তব্য এবং ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ঘটনাবলীই কি প্রমাণ করে না, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সসম্মানে বেঁচে থাকার কারণ? প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতপন্থী বিধায় ১৯৭৪ সালেই বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিনকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে দেন এবং ১৯৭৫ সালে হেনরী কিসিঙ্গার বাংলাদেশ সফরে এলে কিসিঙ্গার নারাজ হতে পারেন ভেবে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিনকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করা থেকে পর্যন্ত বিরত থাকেন। এ ঘটনাই বা কি প্রমাণ করে?

২৮. ১৯৭১ সালে রাজাকার, আলবদর ও শান্তি কমিটিসমূহ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। কারা ছিল এই রাজাকার–আলবদর? এদের প্রতি কি ছিল বঙ্গবন্ধুর আচরণ ও দৃষ্টিভংগী? এব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মী, তৎকালীন পাবনা জেলা গভর্ণর ও বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদ রচিত "ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টসঃ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড" শীর্ষক গ্রন্থে বিবৃত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যাক। এই গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, রাজাকার বাহিনী ছিল সরকারী বাহিনী এবং এর পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব আবদুর রহীমকে স্বয়ং বঙ্গবন্ধুই প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়েটের প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। এই গ্রন্থেরই ৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭০ সাল থেকেই পাকিস্তান আর্মীর প্যারামিলিটারী হিসাবে গঠিত হয়েছিল আলবদর বাহিনী। এর অন্যতম সংগঠক জনাব মুসলেহ উদ্দিনকে বঙ্গবন্ধুই এন, এস, আই,–এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। একই গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু শান্তিবাহিনী প্রধান খাজা খয়ের উদ্দিনকে জেল থেকে বের করে এনে নিজ বাসায় খাইয়ে দাইয়ে টিকেট কাটিয়ে পাকিস্তান প্রেরণ করেছিলেন। যে খাজা কায়সার চীনস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হিসাবে মাও সেতুঙ ও চৌ এন লাই–এর সংগে হেনরী কিসিঙ্গারের বৈঠকের বন্দোবস্ত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন দুই বৈরী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেই খাজা কায়সারকে বঙ্গবন্ধুই বার্মার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছিলেন। যেখানে এটা সুস্পষ্ট যে, রাজাকার–আলবদর ছিল পাকিস্তানের সরকারী বাহিনীরই অংশ, সেখানে আপনারা এই রাজাকার–আলবদরদের দায়দায়িত্ব ইসলামপন্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন কেন? বঙ্গবন্ধুর উপরোক্ত ভূমিকা সম্পর্কেই বা আপনাদের মূল্যায়ন কি?

২৯. মুক্তিযুদ্ধের সময়, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে যারা বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ইত্যাদির সংগে জড়িত ছিল, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল–এবিষয়ে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধের পর পর আপনারা ১৫০০ জন পাকিস্তানীকে যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিত

www.pathagar.com

করেছিলেন। এতোজন পাকিস্তানীকে শাস্তি দেওয়ার সাধ্য আপনাদের নেই– একথা বুঝতে পেরে পরবর্তীতে আপনারা যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা কমিয়ে ১৯৫ জনে নিয়ে আসেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এই ১৯৫ জনের একজনেরও কেশাগ্র স্পর্শ করা আপনাদের সাধ্যে কুলোয় না। বাংলাদেশের মতামতের কোন তোয়াক্কাই না করে ভারত পাকিস্তানের সংগে সিমলা চুক্তি সম্পাদিত করে এবং তদনুযায়ী ১৯৫ জনযুদ্ধাপরাধীসহ আত্মসমর্পণকারী ৯৩০০০ পাকিস্তানী সৈন্যের সকলকেই পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করে দেয় এবং বিনিময়ে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মুক্ত করে নেয়। আপনাদেরই দ্বারা চিহ্নিত মূল অপরাধীদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর আপনারা লেগে পড়লেন রাজাকার–আলবদর ধরার নামে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জিঘাংসার কাজে। ১৯৭২ সালের ২৪ শে জানুয়ারী জারি করা হলো বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ, ১৯৭২। এই আইনে ৩৭,৪৩১ জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যে বিচার হয় ২৮৪৮ জনের। বিচারে মাত্র ৭৫৬ জন দন্ডপ্রাপ্ত হয় এবং ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পায়। অর্থাৎ দেখা যায় যে, দালাল আইনে বন্দীদের শতকরা ৭০৬ জনই ছিল নিরপরাধ। এই প্রহসন বুঝতে পেরে, বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ১৯৭৩ সালের ৩০ শে নভেম্বর দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সকল ব্যক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাঁরই ব্যক্তিগত নির্দেশে সকলকে এক সপ্তাহের মধ্যে মুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা তৃতীয় বিজয় দিবসে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। মোট কথা, ১৯৭৩ সালের ৩০ শে নভেম্বর বঙ্গবন্ধু স্বহস্তেই এই ইস্যুর কবর দিয়ে দেন। এই পটভূমিতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আপনাদের মূল্যায়ন কি?

৩০· বিজয়ের পরপর সম্ভবতঃ লুটপাটের তান্ডবকে আড়াল করার জন্যই রাজাকার–আলবদর ইস্যু নিয়ে এমন প্রচন্ড ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয় যে, কেউ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সীমাহীন অপকর্মের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ করার সাহস পায় না। তখন কেউ যদি অন্যায় অবিচারের সামান্যতম প্রতিবাদও করতো, অমনি তাকে রাজাকার–আলবদর বলে আখ্যায়িত করে তার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালানোর পর জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো কিংবা সাদা জীপে তুলে নেওয়া হতো। সাদা জীপে একবার যাদের তোলা হতো, আর কোনদিন তাদের খোঁজ পাওয়া যেতো না। এই শ্বেতসন্ত্রাসের ছত্রছায়ায় যে কাজগুলো করা হয়েছিল তা মোটামুটি নিম্নরূপঃ

ক· প্রতিটি পরিত্যক্ত শিল্প কারখানায় ক্ষমতাসীন দলের এক একজনকে প্রশাসক হিসাবে বসিয়ে দেওয়া হলো; শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রেই এসব প্রশাসকদের না ছিল কোন অভিজ্ঞতা না ছিল তেমন শিক্ষাদীক্ষা; তদুপরি অধিগ্রহণের সময় এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কোন হিসাব বা ইনভেন্টরীও করা হয়েছিলনা। ফলে অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রশাসকরা নির্দ্বিধায় লুটেপুটে শিল্প কারখানাগুলোকে ছোবড়ায় পরিণত

www.pathagar.com

করে দিলো। খ. শিল্প কারখানায় ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় ক্ষেত্র বিশেষে ২/৩ গুণ পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মচারী ঢুকিয়ে দেওয়া হলো- যার ফলে পরিত্যক্ত ও অধিগৃহীত শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান-সমূহ শুরুতেই সম্পূর্ণ অলাভজনক ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়লো, -এই দুর্বহ বোঝার কবল থেকে স্বাধীনতার দুই দশক পরও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা ও ব্যাংক বীমাসমূহ মুক্ত হতে পারলো না। গ· আন্তর্জাতিক পাটের বাজার চিরতরে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এই একই গোষ্ঠীর লোকেরা একদিকে বাংলাদেশের পাট পাচার করে দিয়ে ভারতীয় মুদ্রায় নগদ মুনাফা লাভ করতো, অন্যদিকে পাটের শূন্য গুদামগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতো। প্রতিটি পাটের গুদামের ক্ষেত্রেই তারা একান্ড ঘটিয়েছিল। ঘ· অনুরূপভাবে পরিত্যক্ত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, গুদাম-আড়ৎ, সিনেমা হল সবই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীরা দখল করে নিয়েছিল ঙ· অবাঙালীদের বাড়ীঘর, বাণিজ্যিক ভবন, জায়গা-জমিও এই একই গোষ্ঠী আত্মসাৎ করেছিল চ· ক্ষমতাসীন দলের লোকদের মধ্যে পাইকারীভাবে বিলি করা হয়েছিল আমদানী লাইসেন্স। থানা পর্যায়ের কর্মীদের সন্তুষ্ট করার জন্যই শুধু দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৭০০০ নতুন আমদানী লাইসেন্স ছ· পারমিট, রাস্তাঘাট-ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণের কন্ট্রাক্ট, ডিলারশীপ-ডিষ্ট্রিবিউটরশীপ ইত্যাদির একচেটিয়া মালিক হয়েছিল ক্ষমতাসীন দলের লোক, জ এ সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী এসেছিল তার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই আত্মসাৎ করা হয়েছিল। শুধু ভারতেই পাচার করা হয়েছিল তৎকালীন মূল্যে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা মূল্যের ত্রাণ সামগ্রী। এই পটভূমিতে দেশীবিদেশী পত্রপত্রিকায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর লুটপাট ও রিলিফ চুরির খবরাখবর ছাপা হতে থাকলে, বঙ্গ-বন্ধু তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি স্নেহমমতা বশতঃ প্রকাশ্য জনসভা ডেকে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, "এতদিন অন্যেরা খাইছে, এইবার আমার লোকেরা খাইব"। তাঁর দলের লোকদের যারা সমালোচনা করতো, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর ভাষায় বলেছিলেন, "লালঘোড়া দাবড়াইয়া দিমু"। দিয়েছিলেনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বঙ্গবন্ধুও দলীয় নেতা-কর্মীদের মাত্রাহীন লুটপাট ও জাতীয় সম্পদ আত্মসাতে অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন এবং প্রকাশ্য জনসভায় পরম আক্ষেপে বলে ফেললেন, 'চাটার দল সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে"। কারা বঙ্গবন্ধু বর্ণিত এই চাটার দল? কারা দেশটাকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল? আপনারাই নন কি?

৩১. আপনাদের অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার একচ্ছত্র দাবীদারদের রাজত্বকালে বিশ্বের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার সামান্য কয়েকটি এখানে উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যাকঃ

www.pathagar.com

The Statesman ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় লিখেছিল, "The man (Sheikh Mujib), who takes all the major and most of the minor decisions in Bangladesh, is surrounded by flatterers and sycophants, the prisoner of his vanity, caught between insecurity and arrogance, sold on the myths his acolytes peddle him-that he is the saviour of his people and that is all they know and all they need to know." The New York Times ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় লিখেছিল, "Sheikh Mujib's associates concede that he is a poor administrator ..... his loyalties are to his family and the Awami League. He does not believe that they are corrupt and can betray him". The Daily Telegraph এর প্রতিবেদক Peter Gill ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৫ সংখ্যায় লিখলেন, "Bangladesh is sinking steadily into unchartered depths of human misery. Shlikh Mujib, who a week ago assumed dictatiorial powers under a new state of emergency, seems incapable of firm or effective government ------- Sheikh Mujib, who is described as "the best liability Bangladesh has got" both revered as father figure and denounced as incompetent"। প্রতিবেদক Kevin Rafferty, The Financial Times এর ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৫ সংখ্যায় লিখলেন," Clearly it is a loosing battle. Bangladesh is growring poorer everyday. Difficult as it is to imagine, the economy today is in a worse state then at devasatated independence ------Mr, Tony Hagen, the founder of the vast UN aid operation estimated that only one-seventh of relief goods reached the persons to whom it was intended ------Nobody knows the extent of corruption in the country. Some foreigners estimate that upto 2 million tons of rice and 1 million bales of jute are annually taken across into India." জানুয়ারী ২০, ১৯৭৫ সংখ্যায় Kansas Times লিখেছিল," In a normal society, if a man is robbed he loses his money. But in Bangladesh if a man is robbed he loses his life".

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর এই দূরবস্থা কারা করেছিল? কারা তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল? আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি ও শ্বেত সন্ত্রাসের এই দুঃসময়কেই আপনারা বলেছেন' 'স্বর্ণযুগ'। স্বর্ণযুগই বটে কিন্তু কাদের? জনগণের? না আপনাদের?

৩২· আপনারা তো তারস্বরে দাবী করে আসছেন যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে বলবৎ ছিল অবারিত উদার গণতন্ত্র এবং ঠিক তার পর থেকেই এ পর্যন্ত চলে আসছে জঘন্য স্বৈরতন্ত্র। রাজনীতিতে –সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আমলাদের

www.pathagar.com

নাক গলানোর বিরুদ্ধেও আপনারা আজকাল আবেগ থরথর বক্তব্য রাখছেন। এবার দেখা যাক আপনাদের গণতন্ত্রের স্বরূপঃ ক· বিজয়ের পর থেকে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে আপনারা সিরাজ সিকদার, এ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেন সহ অন্ততঃ ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক নেতা–কর্মীকে হত্যা করেছিলেন এবং কোন থানাকে এসব হত্যার বিরুদ্ধে একটি মামলাও গ্রহণ করতে দেননি। এছাড়া কতো বাড়ীঘর যে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, কতোজনকে যে সর্বস্বান্ত করেছিলেন,কতো মানুষকে যে পঙ্গু করে দিয়েছিলেন তার তো কোন সীমাসাক্ষ্যই নেই খ· ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে আপনারা মার্কসবাদী নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী অরুন্না সেন, পূত্রবধূ রীনা সিনহা (১৯) এবং পাশের বাড়ীর হনুফা বেগম (১৬) কে রক্ষীবাহিনী দিয়ে উঠিয়ে আনেন। তারপর তাদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়, সে তুলনায় পাকিস্তান আমলে ইলা মিত্রের ওপর নির্যাতন কিংবা আলজিরিয়ার জমিলা বুইরেদের ওপর নির্যাতনও নিতান্তই তুচ্ছমাত্র। আপনারা বৃদ্ধা অরুণা সেনকে হাত পা বেঁধে কাতোবার যে নদীতে ফেলেছেন এবং তুলেছেন তার কোনই হিসাব নেই। এভাবে হাজার হাজার অরুণা সেনকে আপনাদের 'উদার গণতন্ত্রের' শিকার হতে হয়েছিল গ· ১৯৭৪ সালের ১৭ ই মার্চ জাসদের মিছিলের ওপর গুলী চালিয়ে আপনারা অন্তত ৫০ জন মানুষকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করেন (সরকারী হিসাব অনুযায়ীই নিহতের সংখ্যা ছিল ১২) এবং পরদিন স্বয়ং আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে গিয়ে বঙ্গবন্ধু এভিন্যুস্থ জাসদ অফিস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেন। ঘ· পুলিশ পাঠিয়ে দৈনিক গণকণ্ঠ কার্যালয় সীজ করেন ঙ· ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করেন এবং এর ১১৭ ক (৪) ধারা অনুযায়ী ২৪–২–৭৫ তারিখে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একক দল "বাকশাল" গঠন করেন এবং হুবহু হিটলার ও মুসোলিনীর নাৎসী দলের অনুকরণে আওয়াজ তোলেন, "এক নেতা একদেশ; বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ"। চ· সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সরকারী কর্মচারীদের তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাকশালের সদস্য হতে বাধ্য করেন এবং এভাবে তাঁদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে সরাসরি রাজনীতিতে টেনে আনেন। বাকশাল গঠনের পর আপনারা জেলায় জেলায় যে ৬০ জন বাকশালী গভর্নর নিয়োগ করেন, তার মধ্যে ১৩ জনই ছিলেন সিভিল সার্ভেন্ট ছ· ১৯৭৫ সালের জুন মাসে চারটি মাত্র পত্রিকাকে সরকারী মালিকানায় নিয়ে, বাদবাকি সমস্ত পত্র–পত্রিকা বন্ধ করে দেন এবং এভাবে বিরোধী মতামতকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেন জ আপনারাই বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করেন, ঝ· যেসব ব্যাংক বীমা বা শিল্প কর্মকর্তা আপনাদের নির্দেশ মতো চাঁদা দিতে বা বেহিসাব লোক নিয়োগ করতে অপারগতা প্রকাশ করে, তাদেরকে লালবাহিনী দিয়ে ধরিয়ে এনে প্রকাশ্য রাজপথে বেদমভাবে পিটিয়ে দেন এবং গায়ের জোরে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেন। ঞ·

www.pathagar.com

চতুর্থ সংশোধনীতে ব্যবস্থা রাখেন যে, যারা বাকশালের সদস্য হবে না তাদের সংসদের সদস্যত্ব হারাতে হবে; ফলে জাসদের মাঈনুদ্দিন মানিক ও আব্দুল্লাহ সরকার সদস্যত্ব হারান। অগণতান্ত্রিক চতুর্থ সংশোধনীর প্রতিবাদ করার দরুন এবং বাকশালে যোগদান না করার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আতাউল গনি ওসমানী এবং ব্যারিষ্টার মাঈনুল হোসেনের সদস্যপদও বাতিল হয়ে যায়। এবার বলুন, সেনাবাহিনী আমলা ও পুলিসদের রাজনীতিতে টেনে এনেছিল কারা? সবদল নিষিদ্ধ করে একদল গঠন করা এবং তাতে সবাইকে যোগ দিতে বাধ্য করা কোন ধরনের গণতন্ত্র? কোন ধরনের গণতন্ত্র সমস্ত পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া? কোন ধরনের গণতন্ত্র লালবাহিনী, যুবলীগ প্রভৃতি অসাংবিধানিক বাহিনীর হাতে অস্ত্র ও যখন যা খুশী তা করার অবাধ অধিকার অর্পণ করা এবং প্রচলিত আইনকে পাশ কাটিয়ে বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য গায়ের জোরের আইন (চতুর্থ সংশোধনী) জারি করা? কোন ধরনের আইনের শাসন হাজার হাজার বিরোধী নেতা-কর্মীকে হত্যা করা এবং মামলা করতে না দেওয়া? এই প্রসংগে The Economist, ১১ই আগষ্ট ১৯৭৪ সংখ্যায় লিখেছিল, "The Mujib junta never fought in the freedom struggle and those who did fight 20,000 of them are in Mujib's jail. এধরনের গণতন্ত্রের কথা কি কখনো আব্রাহাম লিঙ্কন বা আর কেউ বলেছেন? এগুলোই যদি গণতন্ত্র হয়, তাহলে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার ও বর্বরতার সংজ্ঞা কি? এখন কেন বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের জন্য আওয়াজ তুলেছেন? জারি করার সময় বুঝি বুঝতে পারেননি যে, এটি একটি কালাকানুন?

৩৩· এভাবে দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল, রিলিফ আত্মসাৎ, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনীক শ্রেণী সৃষ্টি, হত্যা-নির্যাতন হাইজ্যাক, কালাকানুন, সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ, একদলীয় স্বৈরাচার, অন্ধভারত ভক্তি, দুর্ভিক্ষ, পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে আপনারা দেশকে এক মহাবিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে এলেন। অথচ আইয়ুব খানের মোসাহেবরা যেমন আইয়ুব খানকে বোঝাতো, "সদরে পাকিস্তান, সব ঠিক আছে, তামাম জনগণ আপনার জন্য ফানা", ঠিক তেমনি আপনারাও বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতেন, "জনগণ মহাসুখে আছে, বাকশাল কায়েম করায় জনগণের খুশীর অন্ত নাই, বঙ্গবন্ধু বলতে জনগণ অজ্ঞান এবং যতোদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকবে ততোদিন বাকশালকে ক্ষমতা থেকে হঠানোর কারু সাধ্য নেই' ইত্যাদি। এমতাবস্থায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন। অথচ আপনারা, যাঁরা বঙ্গবন্ধুরই বদৌলতে, তাঁরই নাম ভাঙিয়ে নেতা মন্ত্রী এমপি জেলা গভর্নর হয়েছিলেন, রাতারাতি বাড়ী গাড়ী সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমীতে প্রতিষ্ঠানে বড়বড় পদ বাগিয়েছিলেন, তাঁরা কোন প্রতিরোধ দূরে থাক,- তেঁতুলিয়া

www.pathagar.com

থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার কোথাও বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে ৫জন লোকের একটা মিছিল পর্যন্ত বের করলেন না। অথচ আপনাদের অনেকের চামড়া দিয়ে জুতো সেলাই করে দিলেও বঙ্গবন্ধুর ঋণ শোধ হতো কিনা সন্দেহ। সেদিন আপনারা বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যার সামান্যতম প্রতিবাদও করলেন না কেন? কর্নেল ফারুক রশীদ ডালিমদের ভয়ে? কুড়িগ্রাম, কক্সবাজার কিংবা পটুয়াখালীতে ফারুক রশীদদের তখন কি শক্তি ছিল? ঢাকা শহরের বাইরে কোথায় তাদের ট্যাঙ্ক কামান ছিল? কেন আপনারা অন্ততঃ ঢাকার বাইরে হলেও সামান্য মিছিল বিক্ষোভও করলেন না? রক্ষীবাহিনী ছিল আওয়ামী লীগের একান্ত নিজস্ব গেষ্টাপো বাহিনী। এর প্রধান ছিলেন স্বয়ং তোফায়েল আহমদ। কেন তাঁরা সেদিন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একটি বুলেটও ছুঁড়লেন না? আপনারাতো দাবী করছেন, আপনারাই ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করে ফেলেছেন। সেদিন আপনাদের কথাকথিত বীরত্ব কোথায় ছিল? নাকি রক্ষীবাহিনীর নীরবতার পেছনেও ছিল আপনাদের গভীর ষড়যন্ত্র? বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করতে না পারলেও একটি কাজ কিন্তু আপনারা ঠিকই করতে পারলেন। বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ তখনও ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীর সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে, তখনও পড়ে আছে বেগম মুজিব,তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তান ও পুত্রবধূদের লাশ। আর আপনারা সেই লাশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কাজে, নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের প্রতিযোগিতায়। কি ব্যাখ্যা আপনাদের এই আচরণের?

৩৪· বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ, যিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী সভারই একজন সদস্য এবং বাকশালের অন্যতম প্রধান নেতা। নভেম্বর মাসে বিচারপতি সায়েম কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ ও পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পার্লামেন্টই বহাল ছিল। খোন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্যই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দলেরই সদস্য। এক কথায় খোন্দকার মোশতাকও ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দলেরই সদস্য, আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং দলের প্রথম কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ও তিনিই ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। তাঁর সরকারও ছিল সর্বাংশেই বঙ্গবন্ধুর দলেরই সরকার। খোন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভার কিংবা পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে যখন নিয়মিত বেতন নিচ্ছিলেন, পতাকা শোভিত গাড়ী দৌড়াচ্ছিলেন, তখন কি আপনাদের বাস্তবিকই মনে পড়তো বঙ্গবন্ধুর কথা, বেগম মুজিবের কথা ,তাঁর সন্তানদের কথা, শিশু শেখ রাসেলের কথা, শেখ ফজলুল হক মনির কথা? আপনাদের দলের অন্যতম প্রধান নেতা মহিউদ্দীন আহমদ স্বয়ং খোন্দকার মোশতাকের বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন সোভিয়েত নেতা পোদগর্নীর কাছে এবং খোন্দকার মোশতাকের পক্ষে ওকালতি

www.pathagar.com

করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২২ শে আগষ্ট আবদুল মালেক উকিল বিলাতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ পার্লামেন্টারী পার্টির কনফারেন্সে সরকারী দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, "ফেরাউনের (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর) পতন হয়েছে"। কি আশ্চর্য নির্মম ধৃষ্টতা! অথচ, পরবর্তীকালে এই আবদুল মালেক উকিলকেই সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের সভাপতি। খোন্দকার মোশতাক কেবিনেটের অনেকে আজো এই দলের শীর্ষ নেতা। আসলে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর আপনারা যে বিছিলেন, খোন্দকার মোশতাক টিকে যাবেন এবং আপনারাও আমরণ ওজারতী এম, পি,- গিরি ইত্যাদি চালিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। এই ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যেই ১৯৭৫ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর আপনারাই জারি করেছিলেন কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স, (Ordinance No XIX of 1975), যাতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হতে না পারে এবং আপনাদের মন্ত্রীত্ব এম, পি, গিরি ইত্যাদিও বিঘ্নিত হতে না পারে। তারপর, খোন্দকার মোশতাক উৎখাত হওয়ার পর আপনারা রাতারাতি গল্প তৈরী করলেন যে, আপনারা প্রাণের ভয়েই ওজারতী এম, পি, গিরি ইত্যাদি করেছিলেন। হালে আবার শুরু করেছেন আপনাদেরই প্রণীত ইনডেমনিটি আর্ডিন্যান্স বাতিলের আন্দোলনের প্রহসন। এখন জবাব দিন, আজ যাদের আপনারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলছেন, সেদিন কেন তাদের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন? ভয়ে? আবদুল মালেক উকিলের কি ভয় ছিল লন্ডনে? মস্কোয় কি ভয় ছিল মহিউদ্দীন আহমদের? তারা যদি ফারুক রশীদদের এতোই ভয় করতেন, তাহলে লন্ডনে মস্কোয় থেকে গেলেন না কেন? থেকে গিয়ে সত্যকে বিদেশী প্রেসে তুলে ধরলেন না কেন? আর যে বঙ্গবন্ধুর জন্য আপনাদের নেতৃত্ব-মন্ত্রীত্ব-সম্পদ, সেই বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদে ঝুঁকি নয় একটু নিতেনই। তাঁরা যেখানে অকাতরে প্রাণ দিতে পারলেন, সেখানে আপনারা দু একটা বুলেটের ঝুঁকিও নিতে পারলেন না? এইইকি আপনাদের বঙ্গবন্ধু-ভক্তির নিদর্শন? নাকি, শুধু আপনাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহারের জন্যই বঙ্গবন্ধুর নামটুকু প্রয়োজন? এখন কেন ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিলের আওয়াজ তুলেছেন? এটা যে খারাপ – তা কি জারির সময় বুঝতে পারেননি? এসব কর্মকান্ড কি স্বয়ং বঙ্গবন্ধু ও জাতির প্রতি চূড়ান্ততম বিশ্বাসঘাতকতা ও মোনাফেকী নয়?

৩৫. বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত আদর্শ ছিল বাকশাল। এই বাকশাল কর্মসূচী বাস্তবায়নরত অবস্থায়ই বঙ্গবন্ধু নিহত হন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি যদি আপনাদের বাস্তবিকই কোন শ্রদ্ধাবোধ থেকে থাকে, তাহলে আপনারা তাঁর চূড়ান্ত আদর্শ 'বাকশাল' কে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কেন? কেন আজ আপনারা বাকশালের কথা উচ্চারণ মাত্র করেন না? কেন আপনারা বলেন না যে আপনারা ক্ষমতায় গেলে, আবার বঙ্গবন্ধুর বাকশাল ব্যবস্থাই কায়েম করবেন, বাংলাদেশে একটি মাত্র সরকারী দল রেখে বাদ বাকী সব রাজনৈতিক দল ও

www.pathagar.com

সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন, শুধুমাত্র ৪টি পত্রিকা বাদে দেশের সমস্ত পত্র পত্রিকা বন্ধ করে দেবেন? কেন আপনারা বলেন না যে, আপনারা ক্ষমতায় গেলে "বাকশাল" অনুযায়ী আবার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের সরাসরি রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে বাধ্য করবেন? কেন আজ আপনারা বাকশাল কনসেপ্টের সম্পূর্ণ বিপরীত "ফ্রি ইকনমি"র কর্মসূচী হাজির করেছেন? তাহলে আপনারা কি বলতে চান বঙ্গবন্ধু বাকশাল করে ভুল করেছিলেন? তাহলে, সেটাইবা স্পষ্ট করে বলছেন না কেন? আপনারা একদিকে বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, অন্যদিকে দাবী করছেন আপনারাই বঙ্গবন্ধুর একমাত্র একনিষ্ঠ ভক্ত। এটা কি অত্যন্ত নীচুস্তরের প্রবঞ্চনা, শঠতা ও মোনাফেকী নয়? আসলে আপনারাই বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে বাকশাল করিয়েছিলেন, তাঁকে ধিকৃত করার মূল্যে আপনাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এটাই কি সত্যি নয়?

৩৬· ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পরবর্তী ভূমিকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা সমালোচনা যাইই থাকুক না কেন, '৪৬ এর গণভোট, '৫২র ভাষা আন্দোলন, '৫৪–র যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ষাটের দশকের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অনন্য সাধারণ। এই বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জীবনের একটা বড়ো অংশ কাটাতে হয়েছিল কারা অন্তরালে। ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর ৬–দফাই এদেশের মানুষকে দিয়েছিল আঞ্চলিক স্বাধিকারের দিকনির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর ৬–দফা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই সম্ভবপর হয়েছিল ১৯৭০–এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সেই ধ্বস নামানো বিজয়। বঙ্গবন্ধু না হলে এই বিজয় কখনই সম্ভবপর হতোনা, আর এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিই সৃষ্টি হতো না। সুতরাং স্বাধীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও অবদান ছিল ঐতিহাসিক ও অনন্য। একথাও অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি পরিকল্পনা করুন বা না করুন, তাঁর বিশাল ভাবমূর্তিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাঁর বিশাল ভাবমূর্তিই একাত্তুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল, তাজউদ্দিন–মোশতাকের ভাঙন ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সংগে মুজিব বাহিনীর নেতাদের ভাঙনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, লক্ষ তরুণকে জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বাংলাদেশের নিপীড়িত আপামর জনগণকে সংগ্রামী প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং এরই সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপকার না হলেও, বঙ্গবন্ধুর অবদানকে খাটো করে দেখার কোনই অবকাশ নেই। সুতরাং, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ব্যাপারে কোন

www.pathagar.com

বিবেকসম্পন্ন মানুষই দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। দ্বিমত পোষণের কোনই সুযোগ নেই তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলীকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করার বিচার হওয়ার প্রশ্নে। সংগে সংগে ন্যূনতম বিবেক সম্পন্ন মানুষকেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিবার ও দলীয় নেতাদের হত্যা যেমন অপরাধ, ঠিক তেমনি অপরাধ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক হত্যা। আপনাদের কি স্মরণ আছে যে, আপনাদের আমলেই হত্যা করা হয়েছিল শোষিত মানুষের মুক্তির বেদীমূলে নিবেদিতপ্রাণ কমরেড সিরাজ সিকদারকে, জাসদের সহ সভাপতি এবং আওয়ামী লীগেরই সাবেক এম সি এ এডভোকেট মোশাররফ হোসেনকে, মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক মাষ্টার, আবুল কালাম আজাদ, হাদী, মন্টু, রোকন, মীর মোস্তফা সহ হাজার হাজার জাসদ নেতাকর্মীকে? এসব হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে থানাকে একটি মামলাও গ্রহণ করতে দেয়নি তৎকালীন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। এসব হত্যাকান্ডের বিচারের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি? কেন আপনারা বিচার চান না কর্নেল আবু তাহের বীরোত্তম, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরোত্তম, জেনারেল মঞ্জুর বীরোত্তম, কর্পোর‍্যাল আলতাফ সহ প্রতিটি সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিত্বের হত্যাকান্ডের? নাকি আপনারা মনে করেন যে, শুধু আপনাদের দল ও গোষ্ঠীর লোকদের হত্যাকান্ডের বিচার হওয়া উচিত? কিন্তু আপনাদের হাতে নিহতদের হত্যাকান্ডের বিচার হওয়া উচিত নয়? তাহলে কি ব্যাপারটা এই যে, আপনারা কাউকে হত্যা করলে সেটা বৈধ; কিন্তু আপনাদের কাউকে হত্যা করা হলে সেটা অবৈধ? কেউ যদি আপনাদের প্রশ্ন করে, সিরাজ সিকদার মোশাররফ হোসেন– সিদ্দিক মাষ্টার –জিয়াউর রহমান প্রমূখের হত্যার বিচারের যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে বঙ্গবন্ধু, শেখ মনি, সৈয়দ নজরুলদের হত্যার বিচারেরই বা প্রয়োজন কি– তাহলে আপনারা কি জবাব দেবেন ?

৩৭· ১৯৭১–এ যারা বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করেছে, বাড়ীঘর লুট করেছে, ধর্ষণ করেছে তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিৎ ছিল। বিচার হচ্ছিলও। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আজ যদি আবার নতুন করে তাদের বিচার করতে হয়, তাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সংগেসংগে তাদের বিচারও অবশ্যই করতে হবে, যারা ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধোকে হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র হনন করেছে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ, লাইসেন্স পারমিটবাজী, রিলিফ চুরি, ভারতে সম্পদ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেরা সম্পদের পাহাড় বানিয়াছে এবং গোটা জাতিকে দুঃসহ শোষণ ও দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, ভারতে ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার করেছে অথবা পাচারে সহায়তা করেছে, ভারতে পাট পাচার

www.pathagar.com

করে শূন্য গুদামে আগুন লাগিয়েছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, একদলীয় স্বৈরাচার কায়েমের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও সরাকারী কর্মকর্তাদের জবরদস্তিমূলকভাবে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। যারা এসব কান্ড করেছে তাদের অপরাধ রাজাকার আলবদরদের তুলনায় কোন অংশে কম? কেন কম? আসুননা! আমরা একটা গণআদালত গঠন করে উভয় পর্যায়ের অপরাধীদের বিচার করি এবং তদন্ত করে দেখি কারা ১২ কোটি মানুষের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে? উভয় পর্যায়ের ঘাতক দালালদের বিচারে আপনারা রাজী আছেন কি? না থাকলে কেন নেই? গণআদালত প্রসংগে আরও একটি প্রশ্নের জবাব দিন। আজ যদি বি,এন,পি-র সমর্থকরা কিংবা জাতীয় পার্টি কিংবা ইসলামপন্থীরা আর একটা গণ আদালত গঠন করে সমান সংখ্যক জনতার উপস্থিতিতে সি,আর দত্ত, শেখ হাসিনা, জাহানারা ইমাম, আহমদ শরীফ প্রমুখের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে দেয়, তাহলে কি হবে? আপনাদের গণ আদালত-এর রায় কার্যকর করতে সরকার যদি বাধ্য থাকেন, তাহলে ওদের গণআদালত-এর রায় কার্যকর করতেও সরকার বাধ্য থাকবেন না কেন? আপনাদের যুক্তি কি?

৩৮· আপনারা কি জানেন, দু'যুগব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনামের প্রতি ইঞ্চি জমি বোমা, মাইন আর মেশিনগানের গুলীর Splinter-এ ঢেকে দিয়েছিল,নাপাম বোমা ফেলে জ্বালিয়ে দিয়েছিল প্রতিটি গ্রাম, ধ্বংস করে দিয়েছিল প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। তারা স্বাধীনতাও পেয়েছিল আমাদের অনেক পরে। অথচ আজ সেই ভিয়েতনামের জনগণের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ৪০০ ডলারে। আগামী ৫ বছরে তা ১০০০ ডলারে উন্নীত হবে। গত অর্থ বছরে ভিয়েতনাম আয় করেছে ২·৬ বিলিয়ন ডলার। অথচ আমাদের অবস্থা কি? ভিয়েতনামের তুলনায় আমাদের ধ্বংস তো ছিল অনেক কম। পাকিস্তানী হানাদাররা শিল্পকারখানাও ধ্বংস করেনি, কারণ এগুলোর মালিক ছিল তাদেরই জ্ঞাতি ভাইরা। তাছাড়া গত ২২বছর যাবৎ পাকিস্তান তো আর আমাদের শোষণ করছে না। এই ২২ বছরে তো আমাদের অবস্থা পাকিস্তানের তুলনায় অনেক ভালো হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটেছে? ১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় হচ্ছে ৩৯০ ডলার, আর বাংলাদেশের মথাপিছু আয় হচ্ছে মাত্র ১৪৪ ডলার। ভাগ্যবান ০·৫ শতাংশ কোটিপতির আয় বাদ দিয়ে গড় করলে দেখা যাবে যে, ৯৯·৫ শতাংশ হতভাগ্য মানুষের গড় মাথাপিছু আয় ৮০ ডলারেরও কম। পাকিস্তান আজ জঙ্গীবিমান ও পারমানবিক বোমা পর্যন্ত তৈরী করছে, অথচ আমরা মোটর গাড়ীর একটা স্পার্ক প্লাগও তৈরী করতে পারছি না। পাকিস্তানের তুলনায় আমাদের সম্পদ ও সম্ভাবনাতো অনেক গুণ বেশী ছিল। তবু

www.pathagar.com

কেন এমন হলো? কারা এই পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী? ইসলামপন্থীরা, অর্থাৎ যাঁরা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে বদ্ধপরিকর, তাঁরা তো কখনোই যাননি বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায়। আজ পর্যন্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোন সংবিধানই কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ছিল না। স্বৈরাচার প্রণীতই হোক আর গণতন্ত্রী প্রণীতই হোক, প্রতিটি সংবিধানই ছিল পুঁজিবাদভিত্তিক -সুতরাং ইসলাম বিরোধী। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান, পেনাল কোড, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড, সিভিল কোড, টর্ট, আদালতের বিন্যাস, প্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির সংগে কুরআন-সুন্নাহর কোনই সম্পর্ক নেই। জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কেউ 'বেরাদরানে মিল্লাত' এবং কেউ 'নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' জাতীয় আওয়াজ তুললেও, ১৯৪৭ সাল থেকে এযাবৎ ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কেউই কুরআন-সুন্নাহর অনুপন্থী ছিলেন না। মোটকথা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন এবং আছেন আপনাদেরই কোন না কোন গোষ্ঠী। আইন-সংবিধান-প্রশাসন সবই ছিল এবং আছে কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী এবং আপনাদেরই নিরংকুশ স্বার্থের অনুকূল। সুতরাং, আজ যে বিশ্বে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়, ৮৭% মানুষ যে দারিদ্র্য সীমার নীচে, ৬৭% কর্মক্ষম মানুষ যে বেকার বা অর্ধবেকার, ০·৫ শতাংশ মানুষের হাতে যে মোট জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ পুঞ্জীভূত-এর জন্য দায়ী কারা? আপনারা,যারা ক্ষমতায় ছিলেন বা আছেন তারা? নাকি,-যেই ইসলামপন্থীরা কখনো রাষ্ট্রক্ষমতার ধারে কাছেও যায়নি-তারা? আসলে, ১৯৭১-এর বিজয় পরবর্তী সময়ে বেপরোয়া লুটপাট, শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক বীমা ইত্যাদিতে প্রয়োজনের তুলনায় ৩/৪ গুণ শ্রমিক কর্মচারী ঢুকিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানকে ভারসাম্যহীন মাথাভারী সিন্দাবাদের দৈত্যে পরিণত করন, জাতীয় করনের নামে দলীয় করন, ব্রীফকেস ব্যবসার প্রবর্তন, বাংলাদেশকে ভারতের একচেটিয়া অবৈধ বাজারে পরিণত করন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইনষ্টিটিউশনকেই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল এবং জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল মূল্যবোধ হননের এক ভয়াবহ প্রক্রিয়া,-যা ভিয়েতনাম বা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। জন্মলগ্নের এই ক্রমবর্ধমান পাপের বোঝাই জনগণকে বইতে হয়েছে গত ২২ বছর, আরো কত বছর বইতে হবে কে জানে। এটাই কি আমাদের পশ্চাৎপদতার মৌল এবং সম্ভবতঃ একমাত্র প্রধান কারণ নয়? এবং এর জন্য আপনারা,- বিজয় পরবর্তী ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বেনিফিশয়ারীরাইকি প্রায় সর্বাংশেই দায়ী নন?

৩৯·মুক্তিযুদ্ধটা কি পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ছিল? নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে? আজ যারাই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছে, তাদেরকেই আপনারা ঢালাওভাবে রাজাকার আলবদর বলে উপহাস করছেন। রাষ্ট্র-

www.pathagar.com

সমাজ–অর্থনীতির ব্যাপারে কুরআন–সুন্নাহর যে বিধি–বিধান, –তার বিরুদ্ধে আপনারা ক্রুসেড ঘোষণা করেছেন। আজ স্পষ্ট করে বলুন, মুক্তিযুদ্ধ কি আসলে ইসলামেরই বিরুদ্ধে ছিল? যাঁরা ইসলামপন্থী, তাঁরা যদি মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা–চেতনার বিরোধী বলে সাব্যস্ত হন, –তাহলে একই বিচারে, যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সুপক্ষের শক্তি তাঁদের সকলকেও ঢালাওভাবে কুরআন–সুন্নাহ বিরোধী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করতে হয়। আপনারা তো এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন? আপনারাতো এটাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলাম সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী?

৪০· ১৯৭১ সালে ইসলামপন্থীরা সম্ভবতঃ দু'টি কারণে ভারতকেন্দ্রিক, ভারতভিত্তিক ও ভারতনিয়ন্ত্রিত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমতঃ তাঁদের ভয় ছিল যে, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে এতদঞ্চলে ইসলামের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আশংকা করেছিলেন যে, ভারতের আশ্রয়, সহায়তা, ট্রেনিং ও নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে অর্জিত বাংলাদেশ কার্য্যতঃ ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও ভারতীয় রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক স্বার্থেরই লীলাভূমিতে পরিণত হবে। বলাবাহুল্য, ইসলামপন্থীদের প্রথম ভয়টি যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়নি। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে এতদঞ্চলে ইসলাম আদৌ বিপন্ন হয়নি; বরং ইসলামের প্রতি মানুষের নিষ্ঠাই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাঁদের দ্বিতীয় শংকাটি? সেটাও কি ভুল প্রমাণিত হয়েছে? বিজয়ের পর বাংলাদেশ সরকারকেই বাংলাদেশে আসতে না দেওয়া, ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট, আন্তর্জাতিক পাটের বাজার দখল, ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যকে বাংলাদেশের মতামতের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের হাতে সমর্পণ, বাংলাদেশের বাজেট বাংলাদেশের পার্লামেন্টে পেশ হওয়ার আগেই আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে ঘোষণা, তালপট্টি দ্বীপ দখল, গঙ্গা ও তিস্তায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে একতরফা পানি প্রত্যাহার, ব্রহ্মপুত্রেও বাঁধ দেওয়ার আয়োজন, তিন বিঘা করিডোরের ওপর ভারতের একক নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশকে ভারতের বৈধ–অবৈধ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে রূপান্তর, বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানিকৃত পণ্য ভারতে পাচারের ব্যবস্থা, অপারেশন পুশ ব্যাক, বঙ্গসেনা ও শান্তিবাহিনী ইত্যাদির সৃষ্টি ও সযত্ন লালন প্রভৃতি কি একথাই প্রমাণ করে না যে, ১৯৭১–এ ইসলামপন্থীদের ভয় ও আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না?

৪১· তাছাড়া ইসলামপন্থীদের ভারত যাওয়ার কোন পথই কি আপনারা রেখেছিলেন? আপনাদের কি মনে আছে মাওলানা ভাসানী, কমরেড ফরহাদ, কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন প্রমূখ যেসব অ–আওয়ামীলীগ অথচ যথার্থই

www.pathagar.com

অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নেতারা ভারত গিয়েছিলেন, তাঁদের এবং তাঁদের কর্মীদের প্রতি আপনারা কি আচরণ করেছিলেন? সরকারের কোন স্তরে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বের কোন পর্যায়ে কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন প্রক্রিয়াতেই আপনারা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। মাওলানা ভাসানীকে কার্যতঃ অন্তরীণাবদ্ধ করেই রাখা হয়েছিল, অথচ তিনিই ছিলেন রাজনীতির অংগনে স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট প্রবক্তা। তাঁদের মতো প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদেরই যেখানে আপনারা হালে পানি পেতে দেননি, সেখানে কুরআন সুন্নাহর শাসন চায় এমন টুপি-দাড়িধারী ব্যক্তিরা ভারত গিয়ে উঠলে তাদের পরিণতি কি হতো? তাদের আপনারা কি আদৌ বুকে টেনে নিতেন? মুক্তিবাহিনীতে স্থান দিতেন? ভারতের হিন্দু সরকারও কি তাঁদের আদৌ আশ্রয়, অস্ত্র ও ট্রেনিং দিতো? আপনারা অত্যন্তই ভালো করে জানেন, ইসলামপন্থীদের ভারতের মাটিতে পেলে আপনারা তাদের এক মুহূর্তও বরদাস্ত করতেন না; আশ্রয়, অস্ত্র ও ট্রেনিং দেওয়াতো দূরের কথা,- আপনারা এবং দাদারা মিলে তাদের দেখামাত্রই কচুকাটা করে ছাড়তেন। এমতাবস্থায়, প্রাণে বাঁচতে হলে ইসলামপন্থীদের এদেশ থেকে যাওয়া ছাড়া অপর কোন গত্যন্তরই ছিল কি? অবশ্যই ছিল না। আর ইয়াহিয়া-ভূট্টো চক্র এখানে অবস্থানকারী কাউকে নিরপেক্ষ থাকার কোন অবকাশই দিচ্ছিল না। এটাই কি কঠোর সত্যি নয়?

৪২. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরপরই ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মাধ্যমে ধৃত ও পলাতক নির্বিশেষে সকল যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হয়েছিল (এসব অপরাধীদের কেউ কেউ পরে ধরা পড়ায় তাদের পূর্বঘোষিত শাস্তি ধরা পড়ার দিন থেকে কার্য্যকর করা হয়েছিল)। কিন্তু আপনারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারত আপনাদের সে সুযোগ দেয়নি। ভারত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকেই পাকিস্তানের কাছে প্রত্যার্পন করে দিয়েছিল। মূল অপরাধীদের কিছু করতে না পেরে আপনারা লাগলেন রাজাকার-আলবদরদের নিয়ে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, রাজাকার-আলবদর ধরার নামে আসলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাই চরিতার্থ করা হচ্ছে এবং নিরীহ লোকদেরই হয়রানি করা হচ্ছে, তখন স্বয়ং বঙ্গবন্ধুই তাদের সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত 'ভক্তরা' স্বাধীনতার ২১ বছর পর "রাজাকার-আলবদর" ইস্যুকে আবার কবর থেকে উত্তোলন করেছেন এবং 'গণ আদালত' বানিয়ে একজনকে ফাঁসির রায় পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। আপনারা কি জানেন, বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী পুলিশের কাছে খবর পৌছাতে দেরী হলে কিংবা কোন অভিযোগ দায়ের না করা হলেও প্রাপ্ত অভিযোগের প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে সংশোধিত ১০ (ক) অনুচ্ছেদে যে ব্যতিক্রমধর্মী ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করে এবং অভিযোগ পেশ করার অনির্দিষ্ট সীমা

www.pathagar.com

নাকচ করে এই সুযোগ সীমিত করে দেন? বিচারপতি কে এম, সোবহান পরিচালিত 'লুৎফার মৃধা বনাম রাষ্ট্র' মামলায় আদালত বলেন যে, পুলিসের কাছে অভিযোগ পেশ করার সময়সীমা ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার দেড় বছর পর দায়েরকৃত অভিযোগের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যাখ্যা না থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। উল্লেখিত মামলায় অভিযুক্তকে মুক্তিদানের জন্য আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬)। যেখানে স্বাধীনতার দেড় বছর পর দায়েরকৃত মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আপনারা স্বাধীনতার ২০/২১ বছর পর ৭১-এর ঘাতক দালালদের (?) নির্মুল করার নামে আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। এই "গণ আদালত" স্বাধীনতার ২১ বছর পর কেন? ন্যুরেমবার্গের আদালতে মতো বিজয়ের পরপরই আদালত গঠন করেননি কেন? "ঘাতক দালাল" দের বিরুদ্ধে তখনই মামলা দায়ের করে বিচারের মাধ্যমে রায় ঘোষণা করেননি কেন? নাকি 'ঘাতক দালাল' কারা সেটা তখন বুঝতে পারেননি? এখন গণভিত্তি হারিয়ে বারবার ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হওয়ার পরই সেটা বুঝতে পেরেছেন? নাকি পরিত্যক্ত সম্পত্তি-রিলিফ-পাট পাচার-লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদি নিয়ে আপনারা অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে-সংবাদপত্রে-বিভিন্ন একাডেমীতে-অফিসে-আদালতে উচ্চতর পদ বাগানো এবং ভাগ্যগড়ার কাজে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীরা অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিলেন বলে এদিকটায় তখন মনযোগ দিয়ে উঠতে পারেননি?

৪৩. আপনারা ১৯৯২ সালে "গণ আদালত"-এর মাধ্যমে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু, তিনিতো গত ১৪ বছরেরও বেশী সময় যাবৎ এই ঢাকা শহরেরই নিজ বাড়ীতে বসবাস করে আসছেন এবং কার্যতঃ তাঁর দলের আমীর-এর দায়িত্ব পালন করছেন। এটা বুঝি আপনারা ১৪ বছর যাবৎ টের পাননি? বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়, আপনাদের মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বিচারপতি বদরুল হুদা চৌধুরীকে যখন অনুকম্পা ভিক্ষার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছে পাঠান, তখনো বুঝি জানতেন না যে তিনিই ৭১-এর 'ঘাতক-দালাল' এবং অনাগরিক? অধ্যাপক গোলাম আযম-এর সংগঠন যখন বিগত নির্বাচনে ৪২ লক্ষ ভোট এবং পার্লামেন্টে ১৮টি আসন পেয়ে গেল, ওই সংগঠন যখন সরকার গঠনের সময় আপনাদের সমর্থন না দিয়ে বি, এন, পি কে সমর্থন দিল এবং সর্বোপরি যখন অধ্যাপক গোলাম আযম আপনাদের মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে সমর্থন দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন, ঠিক তারপরই বুঝি আপনারা টের পেলেন যে, তিনিই একাত্তুরের ঘাতক-দালাল ও অনাগরিক? জানতে ইচ্ছে করে, অধ্যাপক

www.pathagar.com

গোলাম আযম যদি আপনাদের প্রার্থনা অনুযায়ী পার্লামেন্টে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আপনাদের প্রতি সমর্থন দিতেন, তাহলেও কি আপনারা তাঁর বিচারের জন্য "গণ আদালত" গঠন করতেন?

৪৪· আপনারাতো এখন "বঙ্গবন্ধু"–এর চাইতেও হৃদয়গ্রাহী "বঙ্গজননী" খেতাব দিয়ে জাহানারা ইমামকে সামনে খাড়া করে মাঠে নেমেছেন। জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধে স্বামী–সন্তান হারিয়েছেন, এজন্য তাঁর প্রতি যে কোন মানুষের সহানুভূতি থাকবে–সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একাত্তুর নির্যাতিতা মহিলাদের প্রতি সত্যিকার দরদ ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে করছেন? আপনাদের কি মনে আছে যে, ১৯৭১ সালে যে লক্ষ লক্ষ মহিলা হানাদারদের হাতে নারীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হারিয়েছিল, আপনারা তাদেরকে "বীরাঙ্গনা" আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কপালে সংশপ্তকের হুরমতির কলংকের মতোই,–কলংকের অক্ষয়টীকা এঁকে দিয়ে সমাজ–পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন? ভালকথা, যেসব হতভাগিনী সীমান্তের ওপারে গিয়ে নেতা–তস্যনেতাদের রক্ষিতা হতে বাধ্য হয়েছিলেন কিংবা ভারতীয়দের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও তো বিশাল–বিপুল। হানাদারদের দ্বারা নির্যাতিতা বীরাঙ্গনাদের পাশাপাশি এসব বীরাঙ্গনাদের কথাও আপনাদের মনে পড়ে কি? আপনারাতো দাবী করেন, আপনাদের আমলে অর্থাৎ ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫–এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে এদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কায়েম ছিল। এই সাড়ে ৩ বছরে "বীরাঙ্গনাদের" পূনর্বাসনের জন্য আপনারা কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন? এই "বীরাঙ্গনারা" আজ কোথায় আছে, কেমন আছে–তার কোন খবর আপনারা রাখেন কি? আপনারা কি জানেন "বীরাঙ্গনার" কলংকের বোঝা বইতে না পেরে আপনাদের রাজত্বকালেই প্রায় ৫০ হাজার হতভাগিনী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল? জাহানারা ইমামের জন্য আপনাদের এতো দরদ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি নির্যাতিতা লক্ষ লক্ষ ভাগ্যবিড়ম্বিতার বেলায় আপাদের দরদ ও বিবেক কোথায় থাকে? সবকিছুর সীমা আছে, শুধু সীমা নাই বুঝি আপনাদের আকাশচুম্বি শঠতা ধৃষ্ঠতা আর পরিহাসের?

৪৫· আপনারাতো সদাসর্বদাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন। কিন্তু আপনাদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধের বা স্বাধীনতার এই চেতনা জিনিসটা কি? আর সেটা কায়েমইবা হবে কিভাবে? আপনারা তো ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত বলেছেন, সমাজতন্ত্রের কথা। সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে কায়েমও করেছিলেন একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থা। অথচ এখন বলছেন, ফ্রি ইকনমির কথা। স্পষ্ট করে বলুন মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার চেতনা বলতে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন? সেই চেতনা কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

www.pathagar.com

মাধ্যমে কায়েম হবে? নাকি ক্লিন্টনীয় মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে? স্বাধীনতার চেতনা কি বাকশালের মতো একদলীয় স্বৈরাচার, নাকি বহুদলীয় গণতন্ত্র? আপনারা তো যখন যেমন সুবিধা তখন তেমন রূপ ধারণ করেছেন (একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ইহুদীবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি অন্ধভক্তির ক্ষেত্রে ছাড়া)। এখন জনগণ কেমন করে বুঝবে আপনাদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার চিন্তা-চেতনার জিনিসটাই বা কি, আর তা কায়েমই বা হবে কেমন করে?

৪৬· আপনারা অধ্যাপক গোলাম আযম-এর শাস্তি চাইছেন, খুবই ভালো কথা। কিন্তু মেজর জেনারেল সি, আর, দত্ত যে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ আহূত প্রকাশ্য সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতের প্রতি উদাত্ত আহবান জানালেন, তখন আপনারা ওই আহবানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিলেন কেন? কেন প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না? অথচ সি আর দত্তের এই আচরণ যেকোন বিচারেই চূড়ান্ত দেশদ্রোহিতা বা হাই ট্রীজন। একবার ভাবুনতো,- ভারতের কোন মুসলমান নাগরিক যদি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য পাকিস্তান কিংবা ইরানের প্রতি আহবান জানাতো,- তাহলে সেই মুসলমানটির পরিণতি কি হতো? ভারত সরাকার বা ভারতের কোন নাগরিক কি তা বরদাস্ত করতো? আপনারা ভালো করেই জানেন, বরদাস্ত তো দূরের কথা পরিণতিতে ওই মুসলমানটির শরীরের হাড়মাংস ছিন্নবিছিন্নতো করা হতোই, তারই সঙ্গে এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে মুসলিম বিরোধী একটা দাঙ্গা বাধায়ে দিয়ে হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণ হরণ করা হতো। অথচ আপনারা এখানে সি, আর, দত্তের পক্ষই অবলম্বন করলেন। সি, আর, দত্তদের সকল কর্মকান্ডের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন না দিলে বিদেশী প্রভুরা গোস্বা করবেন,-এটাই কি আপনাদের ভয়? নাকি আপনারা মনে করেন যে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ এবং ভারতের দাসত্ব এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের যুপকাষ্ঠে আত্মবলিদানই হলো সত্যিকার প্রগতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশপ্রেম?

৪৭· এটাতো আপনাদের গভীরতম বিশ্বাস যে, ভারতে যা কিছুই ঘটে, তাইই ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল এবং সংস্কৃতির সুষমামন্ডিত। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যেই ভারতে মোট ৭৯৪৬টি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং ভারতীয় হিসাবেই এতে নিহত হয় ৭৯৬৫ জন এবং আহত হয় ৪৩,৩১১ জন মুসলমান (ভারতের প্রগতিশীল পত্রিকা "ফ্রন্ট লাইন," ১৫ নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যা)। এই হিসাবে ভারতে প্রতিবছর গড়ে ২৬৫টি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রয়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময়ে

www.pathagar.com

সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১৩,৯০৫ টি দাঙ্গা। ১৯৭৮ সালের ২৭ শে মার্চ তারিখে খোদ পশ্চিম বঙ্গ সরকার পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় বিস্তারিত তালিকা প্রদান করে দেখান যে, ওই সময় পর্যন্ত শুধু কোলকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ এবং ৭টি মাযার-গোরস্থান হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে ২০/১ বেলগাছিয়া রোডস্থ দোতলা মসজিদ থেকে শুরু করে ১৯৭ বৌবাজার স্ট্রীটস্থ মাযার পর্যন্ত ৫৩টি মসজিদ/মাযারের নাম। এই অনুপাতে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়ে সমগ্র ভারতব্যাপী কি বিশাল পরিমাণ মসজিদ/মাযার হিন্দুরা দখল করেছে তা সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি ভারতের হিন্দুরা ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায় অমান্য করে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তার বুকের ওপর রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে এবং ভারতের নরসিমা রাও সরকার সুপ্রীম কোর্টের রায় ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে এযাবৎ কাশ্মীরের মুক্তিকামী মুসলমানদের ওপর লাগাতার নির্যাতন চালিয়ে আসছে, হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে, ভারতীয় সৈন্যেরা অসংখ্য কাশ্মিরী মুসলমান রমনীর শ্লীলতা হানি ঘটিয়েছে এবং এই নির্যাতনের প্রক্রিয়াকে দিনে দিনে ভয়াবহতর করে তোলা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা "টাইম" এর গত ২৫শে জানুয়ারী সংখ্যায় "ওদের জ্বালিয়েদাও" শিরোনামে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে শিবসেনা নেতা বল থ্যাকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "মুসলমান নয়, ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদেরই মাতৃভূমি,---–মুসলমানেরা যদি (ভারত থেকে) চলে যেতে না চায়, ওদেরকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া উচিত"। উপরোক্ত বক্তব্য ও তথ্যাদি সম্পর্কে, আপনাদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র দাবীদারদের বক্তব্য কি? আপনারাও কি মনে করেন, হিন্দুদের দ্বারা মসজিদ দখল, মুসলমান হত্যা ও মুসলিম নারী ধর্ষণ খুবই ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল কাজ? আপনারাও কি বল থ্যাকারের সংগে একমত যে ভারতের প্রায় ১৩ কোটি মুসলমানের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত, নতুবা ভারতের সব মুসলমানকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা করাই বিধেয়? করুন না একটু আত্মবিশ্লেষণ। দেখুননা, আপনারা যেসব তথাকথিত ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী-প্রগতিবাদীদের অনুসরণ করছেন, তাঁরা হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কি ভূমিকা পালন করছেন। আর আপনারা কি করছেন?

৪৮ প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক নীরদ সি· চৌধুরী শারদীয় সংখ্যা (১৩৯৯) 'দেশ'-এ বাংলাদেশকে "তথাকথিত বাংলাদেশ" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "একজন মুসলমান পাঠান হতে পারে, তুর্কী হতে পরে, মুঘল হতে পারে-কিন্তু কখনোই ভদ্রলোক হতে পারে না" (উপ সম্পাদকীয়, দৈনিক বাংলার বাণী, জানুয়ারী ৩১, ১৯৯৩) এবার একটু অতীতের দিকে ফিরে চলুন। 'আনন্দমঠ'

www.pathagar.com

'রাজসিংহ' ও 'দুর্গেশ নন্দিনী' ইত্যাদি উপন্যাসে তীব্রতম মুসলিম বিদ্বেষের বিষ যিনি ছড়িয়েছেন, উগ্রতম ব্রাহ্মণ্যবাদী সেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসংগও না হয় বাদ দিলাম। উদার বলে কথিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক। ১৯৩৩ সালে লিখিত "হিন্দু মুসলিম মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "হিন্দু মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ। এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মপ্রবঞ্চনা করি কিসের জন্য! এ মোহ আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ। সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃংখল হইতে মুক্ত করার দায়িত্ব একা হিন্দুদের"। বিমলানন্দ শাসমল তাঁর "স্বাধীনতার ফাঁকি" গ্রন্থে লিখেছেন, "একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা, তা সে বাঙ্গালী হোন বা মারাঠি হোন, সাধারণভাবে মুসলিম বিরোধী ছিলেন"। বিমলানন্দ শাসমল "ভারত কি করে ভাগ হলো" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, হিন্দুরাই মুসলিম বিদ্বেষের দরুন ভারতকে বিভক্ত করেছে। বিভিন্ন ভারতীয় জেনারেল, বুদ্ধিজীবী ও পত্রপত্রিকার মতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতীয়দেরই অবদান। বি, এল, এফ, বা মুজিব বাহিনীর স্রষ্টা জেনারেল সুজন সিং উবান (বর্তমানে একটি আশ্রমে বসবাসরত) তাঁর " Phantoms at Chittagong:Fifth Army in Bangladesh" শীর্ষক গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, চট্টগ্রাম বন্দর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম–এর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ওপর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, তৎকালীন রেসকোর্সে যখন জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করছিলেন, ঠিক তখনই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করছিলেন, "আমরা যখন এখানে কথা বলছি, তখন এই উপমহাদেশে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হচ্ছে। ভারত দ্বিতীয়বার মুক্ত হচ্ছে"। আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতির একচ্ছত্র দাবীদার, উপরোক্ত বিষয়–সমূহ সম্পর্কে তাঁদের মতামত কি?

৪৯· আপনারা তো বিশ্বাস করেন যে ভারত ও হিন্দুরা যাইই করে তাইই সঠিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল। এবার দেখুন, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা–সভাপতি মানবেন্দ্র নাথ রায় এব্যাপারে কি বলেছেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত "Historical Role of Islam" গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "ভারতের বেশীর ভাগ মানুষই গোঁড়া হিন্দু। মুসলমান মাত্রই তাদের কাছে "ম্লেচ্ছ" "অশুচি" "বর্বর"। নিজেদের সমাজের নিম্নতম বর্ণের মানুষের প্রতি যে ধরনের আচরণে এরা অভ্যস্ত, তার চেয়ে ভাল ব্যবহার এদের বিচারে কোন মুসলমানেরই প্রাপ্য নয়। মুসলমান যতোই সদ্বংশজাত হোক, সংস্কৃতিবান হোক, গোঁড়া হিন্দুর বিচারে এর কোন ব্যতিক্রম নেই"। এবার আসুন সাম্প্রতিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ভবানী সেন গুপ্তের

www.pathagar.com

ভাষ্যে। Hindu Nationalism Closing Indian Mind শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "The barbaric communal killings in Bombay in the wake of the Ayodhya incident, the bragging of men like the Shiv Sena supremo that his men were responsible for the demolition of the Babri Masjid and "I am proud of it," the large- scale penetration of the minds of millions upon millions of Indians by the RSS, BJP and their allied 'Hindutva' bodies, are the clearest and most fearsome evidence of how many human minds in the world's largest democracy have closed down for a mass return to an atavistic past, falsely glorified by the engineers of hatred, fanaticism, beastliness and worse. ..... At the same time pervasive corruption has overtaken our political and social life, human sensibilities have disappeared behind meaningless slogans of socialism and equity, the bureaucracy is emerging as the real governing power, the law and order forces have fallen victim to partnership and corruption ..... The RSS- BSP- VHP combine has taken full advantage of this aggressive confusion prevailing in the power structure and is determined to fundamentally change the character of Indian polity by transforming secular democracy into a Hindu rashtra (state) ..... The Hindu forces have now projected a doctrine of Hindu nationalism as the only force that can keep India united and strong, maintain upper caste and upper class rule, divert people's minds from the pressure of radical political and social change. Hindu nationalism is being projected by different top-ranking leaders of the Sangh Parivar (RSS family) with different overtones and undertones" (পূনঃ মুদ্রিতঃ Dhaka Courier, 12 March 1993)। এর আগে ভারতীয় সাংবাদিক আশীষ নন্দী লিখেছিলেন, "As India getting modernized, communal violence is increasing. In the earlier centuries riots were rare. After independence, we used to have one riot a week. Now we have more than one riot a day" (Illustrated Weekly of India, July 20-26, 1986).

এরপরও কি আপনারা ধারণা পাল্টাবেন না? এরপরও কি আপনারা উদ্বাহু হয়ে বলতেই থাকবেন যে, বাস্তবে যাইই ঘটুকনা কেন, ভারত সরকার, ভারতের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই ধর্মনিরপেক্ষতা–ও প্রগতিশীলতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিমূর্তি?

৫০· আপনারাতো গদগদ চিত্তে দাবী করে থাকেন ·যে ভারতই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার শ্রেষ্টতম উদাহরণ। ভারতে মুসলমানদের যে সংখ্যা তাতে সরকারী–বেসরকারী কর্মকান্ড ও ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলমানদের অংশ থাকার কথা শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো নিম্নরূপ :

পদের নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	মুসলমান সদস্যের সংখ্যা	মুসলমানদের শতকরা হার
কেন্দ্রীয় সচিব (অতিরিক্ত ও যুগ্ম সচিবসহ)	৪১৬	৬	১·৪০
আই·এ· এস· আফিসার	৩৮৮৩	১১৬	৩·০০
ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস ক্যাডার	১৭৫৩	৫০	২·৮৫
স্টেট ব্যাংকের কেন্দ্রীয় বোর্ড সদস্য	১৯	–	০·০০
স্টেট ব্যাংকের প্রিন্সিপ্যাল অফিসার	২৭	১	৩·৭০
ভারতীয় শিডিউল ব্যাঙ্ক সমূহের পরিচালক	৪৭৩	৬	১·২৭
ইনস্যুরেন্স কোম্পানীসমূহের পরিচালক	২২৫	৪	১·৭৮
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীসমূহের পরিচালক	৬৪৬৫	১১০	১·৭০
৭৩টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক	৪৮৪	৬	১·২৪
পন্ডস, বুকবন্ড, মুকুন্দ আয়রণ, ইন্ডিয়ান টোব্যাকোসহ ১২টি শিল্প প্রষ্ঠিানের কর্মকর্তা	৩৪১৩	৫৯	১·৭৩

এটা হলো ১৯৮১ সালের হিসাব। ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের অবস্থা আরও শোচনীয়। মুসলমানদের হাতে মোট জমির পরিমাণ ভারতের মোট জমির ৫ শতাংশেরও কম। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় সকল হিন্দুই (রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সরকারী চাকুরে, সাহিত্যিক, শিল্পী নির্বিশিষে) ভারতে

www.pathagar.com

পাড়ি জমিয়েছিলেন। ডঃ জাকির হোসেন, মাওলানা আবুল কালাম। আযাদ, ফখরুদ্দীন আলী আহমদ, রফি আহমদ কিদওয়াইদের পর্যায়ের একজন হিন্দুও পাকিস্তানে থাকেননি। কারণ, তাঁরা তাঁদের জন্মভূমিকে আপন বলে ভাবতে পারেননি। তাঁদের কাছে আপন ছিল হিন্দু ভারত। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানেরা তা কখনোই করেননি– প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলমানকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা সত্ত্বেও শুধু বিহার অঞ্চলের কিছু গরীব ও গরীব মধ্যবিত্ত মুসলমান (সম্পূর্ণ বা অর্ধেক আত্মীয় স্বজনদের সাম্প্রদায়িক খড়্গের নীচে বলি দিয়ে) পাকিস্তানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুসলমানদের একচেটিয়া ভারত ত্যাগ না করার কারণ জন্মভূমির প্রতি মমতা ও আনুগত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা আজ এ পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো কেন? আপনারা কি বলতে চান, এই অবস্থা আসলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতারই অনাবিল ফলশ্রুতি? ভারতের অসাম্প্রদায়িকতারই অব্যর্থ লক্ষণ? এই অবস্থার সংগে আর এস এস–বিজেপি–বল থ্যাকরেদের স্পষ্ট বক্তব্য যোগ করলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়?

৫১· বাংলাদেশে আজ খুন–ডাকাতি–হাইজ্যাক, ঘুষ–দুর্নীতি, অশ্লীলতা–পতিতাবৃত্তি, শোষণ–বৈষম্য, শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্য ইত্যাদি সর্বকালের সর্ব রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে। দ্রব্যমূল্য আজ সর্বোচ্চ পর্যায়ে। দারিদ্র্য বেকারত্ব–হতাশা আজ গগণচুম্বি। বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের ওপর আজ চেপে বসেছে গড়ে ৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশী পরিমাণ বিদেশী ঋণের বোঝা। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের রাজত্ব। এদেশে ৮৭٪ মানুষের জীবনমান দারিদ্র সীমার নীচে, কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৬৭٪ বেকার বা অর্ধবেকার, ৭৭٪ মানুষ নিরক্ষর, ৯০٪ মানুষ পরিমিত চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত, শতকরা ০·৫ ভাগ লোকের হাতে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৭০٪ পূঞ্জীভূত। আপামর জনগণের জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু, আপনাদের কর্মকান্ড দেখে মনে হয়, এসব আসলে কোন সমস্যাই নয়, দেশের একমাত্র সমস্যা হলো ইসলাম এবং অধ্যাপক গোলাম আযম। আপনারা এরকম ঘোষণাও দিয়েছেন যে, "এবারের সংগ্রাম গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম"। কি আর্শ্চয! গোলাম আযম কি বাংলাদেশ সরকার, নাকি দখলদার পাকিস্তানী বা মার্কিন সামাজ্যবাদ যে, আপনাদের এবারের সংগ্রাম তাঁরই বিরুদ্ধে? তবে হাঁ, আপনারা যদি এরকম নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের ফাঁসি হলে কিংবা তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে খুন ডাকাতি, হাইজ্যাক, ঘুষ–দুর্নীতি, অশ্লীলতা ইত্যাদি নির্মূল হয়ে যাবে, দ্রব্যমূল্য কমে যাবে, বেকারত্ব দূর হবে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থাকবে না, গঙ্গা–তিস্তা– ব্রহ্মপূত্রের পানি অবারিত হবে, শান্তি বাহিনী বঙ্গসেনার উৎপাত থাকবে না, ১২ কোটি নিপীড়ত মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জিত হবে, তাহলে

www.pathagar.com

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই গোলাম আযমের ফাঁসির দাবীতে আপনাদেরই নেতৃত্ব ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন,–১২ কোটি মানুষের দৃষ্টিকোন থেকে দেশের বর্তমান মূল সমস্যা কোনটি? দুর্নীতি–শোষণ–বেকারত্ব–দারিদ্র ইত্যাদি? নাকি অধ্যাপক গোলাম আযম? জনগণের বাঁচা মরার সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে কেন আপনারা গোলাম আযম এর মতো একটি নন–ইস্যুকে ইস্যু করে তুলেছেন? কেন আপনারা জনগণের দৃষ্টিকে মূল সমস্যাবলী থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন? বলুন, কার স্বার্থে আপনারা এই মরণ খেলায় মেতে উঠেছেন?

৫২· পাকিস্তান ও পাকিস্তানীদের সংগে অন্তরংগতা যদি অনভিপ্রেত ও অপরাধমূলক হয়, তাহলে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু তনয়ার অবস্থান আপনারা কিভাবে বিচার করবেন? প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই জানেন যে, একাত্তুরে বাংলাদেশের ওপর নৃশংসতম হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চাপিয়ে দেওয়ার মূল হোতাই ছিল জুলফিকার আলী ভূট্টো। এই জুলফিকার আলী ভূট্টোই ১৯৭০ সালের মাঝমাঝি সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলেছিল, "পূর্ব পাকিস্তান কোন সমস্যাই নয়। বিশ হাজারের মত লোককে মারতে হবে এবং তাহলেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে" (জেনারেলস্ ইন পলিটিক্স; এয়ার মার্শাল আসগর খান, পৃষ্ঠা–২৮)। নগ্ন ক্ষমতালোলুপ ভূট্টো যদি সেদিন মদ্যপ ইয়াহিয়াকে উস্কে না তুলতো, তাহলে পাকিস্তানের তৎকালীন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের হাতেই যথাসময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যেতো এবং মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের কোন প্রশ্নই উঠতো না। পাকিস্তানী নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর খান, আরিফ ইফতিখার, দৌলতানা প্রমূখও এই অভিমতই পোষণ করেন যে, পাকিস্তান ভাঙার জন্য মূলতঃ ভূট্টো ইয়াহিয়াই দায়ী এবং একাত্তুরের যুদ্ধ তাদেরই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। অধিকাংশ পাকিস্তানী জেনারেলের মতামতও একই রকম। এই ভূট্টো–ইয়াহিয়া চক্রই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করেছে,– কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে আশ্রয়–খাদ্য–নিরাপত্তা দিয়ে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। ৩ লক্ষাধিক বাঙালীকে পাকিস্তানে আটকে রেখে, ৮ই জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধুকে এই ভূট্টোই মুক্তি দিয়ে দেয়। ভারতের আপত্তিকে উপেক্ষা করে এই বঙ্গবন্ধুই ১৯৭৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান গমন করেন এবং এতে ভারত বিক্ষুব্ধ হয় ও কোলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে হিন্দুরা বঙ্গবন্ধুর কুশপুত্তলিকা ভস্মীভূত করে। এখানেই শেষ নয়। বঙ্গবন্ধুই একাত্তুরের গণহত্যার মূলনায়ক জুলফিকার আলী ভূট্টোকে বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য দাওয়াত দিলে, ১৯৭৪ সালের ২৪শে জুন জুলফিকার আলী ভূট্টো ১০৭ জন সদস্যের এক বিশাল বহর নিয়ে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আসে এবং এই ভূট্টোকে ইন্দিরা গান্ধীরই সমকক্ষ রাজকীয় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। কিছুদিন আগে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু কন্যাও পাকিস্তান গিয়ে ওই ভূট্টোকন্যার সংগেই অন্তরংগ সম্পর্ক স্থাপন করে আসেন। অথচ এই ভূট্টোকন্যার দলেরই শীর্ষতম নেতাদেরই অন্যতম হলো ৭১–এর গণহত্যার দানব জেনারেল টিক্কা খান। এমতাবস্থায়, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা সম্পর্কে আপনারা কি মূল্যায়ন করবেন? আসল কথা কি এই নয় যে, বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধু বা তাঁর দলের কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা Ideology ছিল না (৬–দফা কোন আদর্শ নয়, ৬টি দাবী মাত্র) এবং এদলে ভারতপন্থী–মর্কিনপন্থী–পাকিস্তানপন্থী নির্বিশেষে বিভিন্ন স্তর ও স্বার্থের মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। ৬–দফাও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিংবা শোষিত মানবতার মুক্তির কোন সনদ ছিল না, এটি ছিল পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও আমলাদের সংগে এঁটে উঠতে না পারা পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী পেটিবুর্জোয়া ও আমলাদেরই স্বার্থরক্ষার দাবী। বঙ্গবন্ধুর বা তাঁর পরিবারের সংগেও ভূট্টো বা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের কোন বৈরী সম্পর্ক ছিল না। বঙ্গবন্ধু যখনই পশ্চিম পাকিস্তানে যেতেন, তখনই কোটিপতি ২২ পরিবারের অন্যতম হারুনদের বাড়ীতেই মেহমান হতেন, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন হারুনদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান; তাঁর ধানমন্ডির বাড়ীটিও ছিল সেই সূত্রেই লব্ধ; কোন অন্যায় বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমে অর্জিত নয়। ১৯৭১–এর ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়ার পর অপ্রস্তুত– অসংগঠিত আওয়ামী লীগ নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ভারত যদি আশ্রয় না দিতো, তাহলে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার দ্বিতীয় কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভারতের অনুকম্পার কোন প্রয়োজন হয়নি; তাঁর শারীরিক অস্তিত্বের জন্য তাঁকে খেতে হয়নি ভারতের নিমক। ফলে এব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বদাই দ্বিধান্বিত। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য ইন্দিরাজীর প্রতি এবং সপরিবারে জীবন রক্ষার জন্য ভূট্টোর প্রতি তাঁর ছিল প্রায় সমতুল্য কৃতজ্ঞতাবোধ এবং এজন্যই তিনি ইন্দিরাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সই করেছিলেন ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তিতে, আর ভূট্টোকে খুশী করার জন্য যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে এবং সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ইনষ্টিটিউশনালাইজ বা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পর্কেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এটাইকি আসল সত্যি নয়?

৫৩· এবার আসা যাক ইসলামের কথায়। ইসলামী জীবনাদর্শের কথা শুনলেই আপনারা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রবক্তাদের 'মৌলবাদী' 'রাজাকার আলবদর' ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে শুরু করেন। বস্তুতঃ, তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী খৃষ্টানদের বিপরীতে যুক্তি বিবর্জিত প্রাচীনপন্থী অন্ধ ক্যাথলিকদেরই বলা হতো মৌলবাদী। অথচ, আপনারা ইসলামকেই বলছেন মৌলবাদ।

www.pathagar.com

এতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান অনুপস্থিত অথবা নিতান্তই সীমিত। এটা সম্ভবতঃ আপনাদের জানা নেই যে, খৃষ্ট, হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের মতো ইসলাম কতিপয় আচার অনুষ্ঠান, সদাচারের উপদেশ ও আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণীরই সমষ্টিমাত্র নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। কুরআন ও হাদিসে রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি আইন ব্যবস্থা, যুদ্ধনীতি, বাণিজ্যনীতি, সম্পদের বন্টন নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিগনির্দেশনা দেওয়া আছে এবং সেগুলো পুংখানুপুংখরূপে মেনে চলা সকল কালের সকল মুসলমানের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অন্যায় অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম বা জিহাদকে। আপনারা হয়তো এটাও জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুধু শ্রেষ্ঠ নবীমাত্রই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান, সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনবিদ, বিচারক, সমরবিদ ও সেনাপতি। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সকল দিকের অনুসরণও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। সর্বোপরি, এটাও আপনাদের জানা নেই যে, ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণীকে সকল দেশে, সকল কালে ও সকল পরিস্থিতিতে এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিশ্বব্যবস্থার অগ্রগতির যে কোন পর্যায়ে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে, এর প্রায়োগিক রূপ নির্ধারণের জন্য রয়েছে 'ইজতিহাদ' 'ইজমা' ও 'কিয়াস' –এর ব্যবস্থা। আদর্শের কালোপযোগী প্রায়োগিক রূপ নির্ধারণের এমন বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্মেতো দূরের কথা, অন্য কোন 'ইজম'– এও আছে বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত; চূড়ান্ত বিচারে ইসলামই হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র যথার্থ অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত ও প্রগতিশীল ব্যবস্থা। অথচ আপনারা কুরআন হাদিসে বিধৃত রাষ্ট্রীয়–সামাজিক–অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জানার এবং তার সংগে পুঁজিবাদী সমাজবাদী ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচারের কোন তোয়াক্কা না করেই অন্ধ একগুঁয়েমীর সংগে বলেই চলেছেন যে, ইসলাম মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি। আপনাদের কেউ অন্ধ একগুঁয়েমীর সংগে ১৮৪৮ সালে রচিত "কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো" বাংলাদেশে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন এবং কিছুতেই বুঝতে চাননি যে, সামন্তবাদী ও উপনিবেশিক অঞ্চল অধ্যুষিত বিশ্বপরিস্থিতিতে এবং ম্যাক্রো বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে গঠিত বস্তুবাদী ধারণা বর্তমান মাইক্রো বিজ্ঞানের যুগে, ধ্রুপদী উপনিবেশের আস্তিত্বহীন এই আন্তর্জাতিক বিশ্বপরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। আপনারা এটাও হয়তো বুঝতে পারেননি যে, এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুনই বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পিরামিড ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে। আবার আপনাদেরই একাংশ বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও বংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের কোন তোয়াক্কা না করেই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার কিংবা লিংকনীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ

www.pathagar.com

হচ্ছেন। অথচ এটা উপলব্ধিই করতে পারছেন না যে, ওই গণতন্ত্র হলো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোরই উপরিকাঠামো মাত্র। সুতরাং জাতীয় পুঁজিবাদী কাঠামো মজবুত না হলে অর্থাৎ জাতীয় চরিত্র সম্পন্ন শক্তিশালী শিল্পপুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে না উঠলে এবং মোট জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান সিংহভাগ না হলে এরূপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সামরিক বাহিনীর রাইফেলের নলের সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। সর্বোপরি, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের পক্ষেই শিল্পোন্নত দেশ সমূহ, তথা নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের চক্রান্ত ও স্বার্থের বলয় ভেদ করে জাতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটানো খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। এটাও আপনারা আদৌ লক্ষ্য করছেন না যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংগে গণতন্ত্রের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দরুনই ওয়ষ্ট মিনিষ্টার বা লিংকনীয় গণতন্ত্র কোন না কোনরূপে বলবৎ আছে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশে। শিল্পে পশ্চাৎপদ কোন দেশে ওই গণতন্ত্র কোনদিন বিকাশ লাভ করেনি, করবেও না। আপনারাতো নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, 'গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি শব্দ কতগুলো ইউনিভার্সাল দার্শনিক ক্যাটেগরী, এসব টার্ম এর যে যেমন খুশী ব্যাখ্যা করবেন, তার কোন অবকাশ নেই। একথা মনে রেখে এখন বলুন সত্যিকার গোঁড়া অন্ধ মৌলবাদী কারা? যারা কুরআন হাদিসে বিধৃত জীবনদর্শন সম্পর্কে কিছুই জানার তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে ইসলামকে গালাগাল করেছেন এবং বস্তুবাদী অগ্রগতির স্তর, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত, আর্থসামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর ম্যাট্রিক্স ইত্যাদি বোঝার কোন ধার না ধেরে বিভিন্ন মুখরোচক ইজম বা মতবাদ অন্ধভাবে ১২ কোটি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন-সেই অন্ধ একগুঁয়ে আপনারাই মৌলবাদী- প্রতিক্রিয়াশীল? নাকি এরূপ গোঁড়ামী মুক্ত, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির সংগে সততঃ খাপ খাওয়াতে সমর্থ ইসলামই মৌলবাদী? আপনাদের বিচারে কি সংজ্ঞা মৌলবাদের? কি সংজ্ঞা প্রগতির? কি সংজ্ঞা গণতন্ত্রের?

৫৪· সবচেয়ে বড়ো কথা, অপনারাতো নিজেদের বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ততম সৈনিক বলে দাবী করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কি আদৌ আপনাদের মতো ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন ছিলেন? তিনি পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেই তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশই হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তিনিই ইন্দিরাজী ও ভারতের দুর্বাশা রাগ বিরাগের তোয়াক্কা মাত্র না করে যোগ দিয়েছিলেন ইসলামী সম্মেলনে,-তাও পাকিস্তানে। তিনিই কথিত রাজাকার আলবদরদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন; তিনিই ভূটোকে দাওয়াত করে এনেছিলেন বাংলাদেশে। আপনারা কি সত্যি সত্যিই বঙ্গবন্ধুর অনুসারী?

www.pathagar.com

৫৫, লক্ষ্যণীয় যে, সুবিধামত কুরআন-সুন্নাহর কোন অংশকে মানার এবং কোন অংশকে না-মানার কোন এক্তিয়ার আল্লাহ কোন মুসলমানকেই দেননি। সুতরাং, কেউ যদি বলেন, 'আমি কুরআন-হাদিসে নির্দেশিত এবং রাসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক চর্চিত রাষ্ট্র-সমাজ -অর্থ ও আইন ব্যবস্থা মানি না," তাহলে তিনি স্পষ্টতঃই আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (দঃ) এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং ফলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেলেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল (দঃ) যেখানে ঈমান -ইবাদতকে ইসলামী রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থ ব্যবস্থা ইত্যাদির সংগে পরস্পর গ্রথিত, সম্পূরক ও অবিচ্ছেদ্য করে দিয়েছেন, সেখানে এর কোন একটি দিককে বাদ দেওয়ার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? স্বয়ং মহানবী (দঃ) যেখানে মসজিদে নববীতে বসে ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন এবং খুলাফায়ে রাশেদাও সেই আদর্শেরই অনুসরণ করেছেন, সেখানে আপনারা বলছেন মসজিদে রাজনীতি আলোচনা করা যাবে না। মসজিদ আল্লাহরই ঘর। সুতরাং মসজিদে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী রাজনীতির আলোচনা অবশ্যই করা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ-রাসুল (দঃ) কর্তৃক নির্দেশিত রাজনীতির আলোচনা মসজিদে করা যাবে না কেন? কোন যুক্তিতে? আপনারা কি ইসলামপন্থীদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী 'সমাজতন্ত্র' বা 'লিংকনীয় গণতন্ত্র'-এর চর্চা করতে রাজী হবেন? যদি তা না হন, তাহলে মুসলমানেরাইবা আপনাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ইসলামী দর্শনের চর্চা করবে কেন? কোন যুক্তিতে? কেন আল্লাহ-রাসুল (দঃ)-এর নির্দেশ বাদ দিয়ে কোন সত্যিকার মুসলমান আপনাদের নির্দেশ ও প্রেসক্রিপশন মানতে যাবে? এটা কি একটি অতি অর্বাচীন দাবী নয়? আর আপনারা যদি মনে করেন যে, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মানতে আপনারা রাজী নন-তাহলে ডঃ আহমদ শরীফের মতো স্পষ্ট ভাষায় আপনারাও কেন বলতে পারছেন না যে, আপনারাও আল্লাহয় তথা আস্তিক্যে বিশ্বাস করেন না, আপনারাও কাফের?

৫৬· সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যতোদিন ছিল, ততোদিন বিশ্বে ছিল পরাশক্তির দু'টি শিবির। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ধ্বংসের পর পরাশক্তির দিক থেকে বর্তমানে বিশ্ব হয়ে পড়েছে এক কেন্দ্রিক বা Unipolar সমাজতন্ত্রের পতনের পর আজ সাম্রাজ্যবাদীদের আঘাতের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে ইসলাম এবং মুসলিম বিশ্ব। লিবিয়ায় অবরোধ, আলজিরিয়ায় ইসলামপন্থীদের ওপর আঘাত, সৌদি আরবে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন, ইরাককে নির্বীর্যকরণ, ইরান ও পাকিস্তানের ওপর আঘাত হানার ক্ষেত্র প্রস্তুতীকরণ, কাশ্মীরে মুসলিম নিপীড়নের ব্যাপারে জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের নির্লিপ্ততা এবং বোসনিয়া-হার্জেগোভীনায় মুসলমানদের নিশ্চিহ্নকরণের প্রক্রিয়া ইত্যাদিই তার প্রমাণ। আর এদিকে আপনারও আপনাদের সর্বশক্তি নিয়ে আঘাতের পর

www.pathagar.com

আঘাত হেনে চলেছেন ইসলামের ওপর। তাহলে, ব্যাপারটা কি এই দাঁড়ায় না যে, সাম্রাজ্যবাদী–ইহুদীবাদী–ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এবং আপনাদের স্বার্থ ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন? এটাই কি সরল সত্য নয় যে, প্রগতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলীর আড়ালে আপনারাই বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ ইহুদিবাদ ও ব্রাহ্মন্যবাদের চর, তল্পিবাহক ও ক্রীড়নক?

৫৭· ইসলামের ওপর আঘাত হানার অন্যতম কৌশল হিসাবে, বাংলাদেশে যেখানে যতো খুন–খারাবী হচ্ছে – তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আপনারা ইসলামপন্থীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। রাশেদ খান মেনন ও রতন সেন –এর আততায়ীরা আত্মস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও আপনারা এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি তাড়িত হয়ে দাবী করছেন যে স্বীকারকারী আততায়ীরা আততায়ী নয়, আসল আততায়ী হলো ইসলামপন্থীরা। আপনাদের এই অদ্ভুত আচরণের দ্বারা দেশের প্রকৃত আততায়ী ও দুষ্কৃতিকারীদের যে শুধু আড়াল করা হচ্ছে তাইই নয়– তাদের সরাসরি প্রশ্রয়, লালন ও পৃষ্ঠপোষকতাও প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সমস্ত খুনী–দুষ্কৃতকারীরা আজ উপলব্ধি করছে যে, তারা যতো অপকর্মই করুক না কেন, আপনারা অর্থাৎ 'প্রগতিবাদী–ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা' তার সমস্ত দায়দায়িত্ব ইসলামপন্থীদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেবেন; ফলে দেশের প্রকৃত পেশাদার খুনী দুষ্কৃতকারী অপরাধীরা সন্দেহ ও ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে এবং তারা একের পর এক খুন–খারাবী–দস্যুতা নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে সমর্থ হবে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। এভাবে আপনারা যে দেশের তাবৎ খুনী–দস্যু–সন্ত্রাসীদের আশ্রয়–প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তাতে জাতির কোন কল্যান সাধিত হচ্ছে? ইসলামপন্থীদের ওপর আঘাত হানার এই অপকৌশল চালাতে গিয়ে কেন আপনারা ১২ কোটি মানুষের সুখ শান্তি ও স্বস্তিকে বিপন্ন করে তুলছেন? কেন সন্ত্রাস–দুর্নীতি অরাজকতায় দেশটাকে ভরে দিচ্ছেন? এটা কোন ধরনের দেশপ্রেম? কি রকমের জনদরদ?

৫৮· আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আহমদ শরীফ–তসলিমা নাসরীন প্রমূখতো প্রকাশ্যেই দাবী করছেন যে, আস্তিকতা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান স্রষ্টায় বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, ভিত্তিহীন ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এখন দেখা যাক, এ ব্যাপারে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা কি বলেন। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব– তথা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জনক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এর পেছনে রয়েছে এক অকল্পনীয় মহাজ্ঞানী সত্ত্বার এক রহস্যময় অভিপ্রায়। বিজ্ঞানীদের সুদূর প্রসারী জিজ্ঞাসা এখানে বিমূঢ় হয়ে যায়, বিজ্ঞানের চূড়ান্ততম অগ্রগতিও সেখান থেকে তুচ্ছ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু সেই অন্তহীন মহাজাগতিক রহস্যের উদ্ভাস বিজ্ঞানীদের এই

www.pathagar.com

সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের দিকেই পরিচালিত করে যে, এই মহাবিস্ময়কর সৃষ্টির একজন নিয়ন্তা আছেন, যিনি অলৌকিক জ্ঞানময়। তাঁর সৃষ্টিকেই শুধু অনুভব করা যায়, কিন্তু তাঁকে মানবকল্পনায় বিধৃত করা যায় না"। স্যার জেমস জীনস্ এ প্রসংগে বলেছেন, "মহাবিশ্ব আমাদের সকলের মনের অতলে অবস্থিত এবং সকল মনের সমন্বয় সাধনকারী কোন এক মহান মহাবিশ্বজনীন মনের সৃষ্টি,–মনে হয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেন সেদিকেই প্রধাবিত হচ্ছে"। পদার্থবিদ ক্লারেন্স এবারসোল্ড–এর মতে, "বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের জন্ম সম্পর্কে একটি মহাপ্লাবনিক তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারে, যা আপাতঃদৃষ্টিতে খুবই যুক্তিযুক্ত। বিজ্ঞান এই ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, গ্রহ–উপগ্রহসমূহ এবং অণুপরমাণুর সৃষ্টি রহস্যের প্রতিও ইংগিত করতে পারে। কিন্তু এই সৃষ্টির উপাদান জড়পদার্থ ও শক্তি কোথেকে এসেছে এবং কেন এই মহাবিশ্ব এমন সুশৃংখল নিয়মের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে (ধরাছোঁয়ার আওতায় প্রমাণযোগ্য) কোন ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান আয়ত্ত্ব করতে পারবে না। অবিমুক্ত চিন্তা ও বিচার শক্তি এই "কেন"–এর জবাবে 'আল্লাহ' সম্পর্কিত ধারণাকেই শুধু দ্বিধাহীন করে তুলবে"। লর্ড কেলভীনতো আরো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে"। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "বিশ্বে পূনর্বার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুহম্মদ (দঃ)–এর মতো নেতৃত্ব আবার প্রয়োজন।" এরকম উদাহরণের অন্ত নেই। এসব বিজ্ঞানীদের কথাই যদি মানতে হয়, তাহলে তো পরম সচেতন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বা আল্লাহয় অবিশ্বাস করার কোন উপায়ই থাকে না। সেক্ষেত্রে আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর রাসুল (দঃ)–এর সুন্নাহয় অবিশ্বাসেরই বা যুক্তি থাকে কোথায়? নাকি আপনারা বলতে চান যে, আইনষ্টাইন কেলভীন প্রমূখ বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের ধারণাটা অবৈজ্ঞানিক? আর আপনারা যাঁরা বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না,–তাঁদের ধারণাটাই বৈজ্ঞানিক?

৫৯· আপনারাতো গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইসলাম একটি মৌলবাদী' 'সাম্প্রদায়িক' 'প্রতিক্রিয়াশীল, 'ভিত্তিহীন', বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, মহাজঘন্য, রাজাকারী–আলবদরী ব্যাপার। এটাও আপনাদের বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত যে, আপনারা ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মহীন। উনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক বাকুনিন–এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাশিয়ার নিহিলিষ্টরা এবং বিশ্বব্যাপী তাদের উত্তরসূরী সন্ত্রাসবাদীরা যেমন বলতো, "শত্রুর রক্তে হাত রাঙাতে পেরেছি বলেই আমরা বিপ্লবী," তেমনি আপনাদেরও প্রতিপাদ্য হচ্ছে, "আল্লাহ–রাসুল (দঃ)–এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পেরেছি বলেই আমরা প্রগতিশীল।" কিন্তু আপনাদের পিতৃপ্রদত্ত নামসমূহও তো আরবী ও ইসলামী, যা আপনাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঘোরতর 'মৌলবাদী' ও 'সাম্প্রদায়িক'। সুতরাং, এসমস্ত মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক নাম ঘৃণার সংগে ত্যাগ করে আপনারা

www.pathagar.com

'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'প্রগতিশীল' নাম গ্রহণ করছেন না কেন? আপনাদের পিতামাতা নিশ্চয়ই আপনাদের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক 'খৎনা'-ও করিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারেইবা আপনারা এখন কি করবেন? আপনাদের পরবর্তী বংশধরদের কি আর সাম্প্রদায়িক খৎনা করানো হবেনা? বিয়ের সময় আপনাদের কোন মৌলবাদী 'আকদ্' 'কাবিন' 'দেনমোহর' ইত্যাদি হয়নি তো? হয়ে থাকলে এব্যাপারেই বা এখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন? এখন কি ওই বিয়েকে নাকচ করে দিয়ে আপনারা ও আপনাদের বংশধররা "লিভ টুগেদার" করবেন? আপনাদের ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার পর আপনাদের কোন মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক কাফন, জানাজা, দাফন, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদি হবেনাতো? আপনারা তো জানেন, আপনাদের আদর্শ রাষ্ট্র ভারতের সাবেক উপরাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিদায়েত উল্যাহ মারা গেলে বিগত ১৯ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে তাঁর মৃতদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম· করীম চাগলা এবং বিশিষ্ট নেতা হামিদ দেলওয়াইকেও একইভাবে পোড়ানো হয়। কমরেড মুজাফফর আহমদকে লালকাপড় জড়িয়ে জানাযা ছাড়াই পুঁতে দেওয়া হয়। ভারতের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিক আবদুল্লাহ রসুল ও সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরেরও জানাযা হয়নি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে এই ন্যাক্কারজনক স্ববিরোধিতা কেন? কেন আপনারাও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারছেন না, "আমরা আমাদের সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী নামসমূহ ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করলাম, প্রত্যাখ্যান করলাম মৌলবাদী আকদ দেনমোহর, কাবিননামা ইত্যাদি, আমরা ও আমাদের বংশধররা এখন থেকে শুধু "লিভ টুগেদার" করবো, আমাদের সন্তানসন্ততিদের কখনো মৌলবাদী খৎনা হবে না, আমরা ভবলীলা সাঙ্গ করলে আমাদের কোন কাফন-জানাযা দাফন হবে না,-আমাদের মৃতদেহকেও ধর্মরিপক্ষেভাবে পুড়িয়ে ফেলা হবে? মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপনারা যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু করেছেন, তার সংগে সংগতি রেখে এরকম বলিষ্ঠ ঘোষণা আপনারা দিতে পারছেন না কেন? মেরুদন্ডহীনতার জন্য? ভন্ডামীর জন্য? নাকি কাপুরুষতার জন্য?

৬০· আপনারা যাঁরা কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে লড়ছেন, তাঁরাতো এটাও দাবী করেন যে, বাংলাদেশের সমগ্র জনগণই আপনাদের পক্ষে। কিন্তু বিগত সাধারণ নির্বাচনে আপনাদের লাইনের সব দল মিলে যে পরিমাণ ভোট পেয়েছে, তা দেশের মোট ভোটের ২৫ শতাংশের বেশী নয়। এই নির্বাচনকে যদি পরিমাপক হিসাবে ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, আপনাদের গণসমর্থন বড়জোর ২৫٪এর মতো। অমুসলিম ভোট বাদ দিলে, মুসলমানদের মধ্যে আপনাদের সমর্থন ১৫٪ এরও কম। এই পরিসংখ্যান থেকে আপনাদের কি কোনকিছু শিক্ষণীয় আছে? আপনাদের কি শিক্ষা নেবার আছে বিগত তিন তিনটি নির্বাচনে আপনাদের শোচনীয় ও পূনঃপৌনিক পরাজয়

www.pathagar.com

থেকে? এই পুনঃপৌনিক প্রত্যাখ্যান কি একথাই প্রমাণ করেনা যে, বাংলাদেশের অন্ততঃ ৭৫% মানুষ আপনাদের কার্যক্রম ও ভূমিকাকেও প্রত্যাখ্যান করে? বাংলাদেশের অন্ততঃ ৭৫% মানুষ আদৌ স্বীকার করে না যে, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আপনাদেরই একক কৃতিত্ব, ৭৫% জনগণ স্বীকার করে না যে, আপনারাই স্বাধীনতার চিন্তা–চেতনার ধারক, ৭৫% মানুষ বিশ্বাস করে না যে ১৬·১২·৭১ থেকে ১৫·৮·৭৫ পর্যন্ত সময়টাই বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ; বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে না আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষতার তথা ধর্মহীনতার তত্ত্বে? আপনাদের বারংবার পরাজয় কি এই মহাসত্যেরই প্রতিধ্বনি নয়?

৬১· আপনারা কি কখনো লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তিনদিকের তিন মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলী ভূট্টো– এই তিনজনকেই বরণ করতে হয়েছে ইতিহাসের নির্মমতম মৃত্যু। এঁদের দু'জনের বুক সাবমেশিন গানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একজনকে লটকানো হয়েছে ফাঁসিকাষ্ঠে। আপনারা কি বলতে চান, এই তিনটি নির্মম মৃত্যু নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার? শুধুমাত্রই কো– ইন্সিডেন্স? এর পেছনে প্রকৃতি ও ইতিহাসের কোন অমোঘ নিয়ম বলবৎ নেই? কিছুই নেই এই তিনটি মর্মান্তিক মৃত্যু থেকে শিক্ষা নেবার? যদি থাকে, তাহলে আপনারা কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন?

।। তিন।।

বস্তুতঃ ইতিহাসের শিক্ষা হলো নিম্নরূপ :

০ বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীদের অন্যতম। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে কখনোই কোন স্ববিরোধিতা ছিল না।

০ বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনব্যাপী সংগাম ছিল অতুলনীয় অসামান্য। কিন্তু এই অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোরই মধ্যে,– যে পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁরও ছিল অসামান্য অবদান। এজন্যই তিনি ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের বৈঠকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, "বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না, রক্তপাত ও উৎপীড়ন ছাড়া। ·····আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয়, স্বায়ত্বশাসনের জন্য" (পাকিস্তান ক্রাইসিস, ডেভিড লোসাক, পৃষ্ঠাঃ ৭১–৭২)। এজন্যই তিনি সিরাজুল আলম খান, আ· স· ম· রবদের চাপ এড়ানোর জন্য সেই রাত্রেই পাকিস্তানী মেজর জেনারেল খাদিম রাজার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং এই আশ্রয় না পাওয়াতেই পরদিন (৭ই মার্চ) উগ্রপন্থীদের মন রক্ষার জন্য বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ৬–দফা প্রদান ও আগরতলা

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র মামলার জবানবন্দী থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের খতিয়ান নিলে দেখা যাবে যে, তাঁর জীবনব্যাপী কর্মকান্ড ছিল অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ,৭ই মার্চের এই বক্তব্যই ছিল শুধুএকমাত্র ব্যতিক্রম।এজন্যই তিনি ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে দশটায়ও পরদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সংগে বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য ডঃ কামাল হোসেনের কাছে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিলেন।

০১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পেছনে সিরাজুল আলম খান -আ, স,ম· আবদুর রব-শাজাহান সিরাজ প্রমূখের জঙ্গী আবেগ ব্যতীত অপর কোন পরিকল্পনাই ছিল না। যুদ্ধের কোন প্রকার ষ্ট্র্যাটেজী, ট্যাকটিকস, চেইন অব কমান্ড, মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি কিংবা পশ্চাদপসরণের কোন পরিকল্পনা ইত্যাদির সার্বিক অনুপস্থিতিই তার প্রমাণ। এই পরিকল্পনাহীনতার জন্যই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দিশেহারা হয়ে সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে কোনরকমে ভারতে পাড়ি দিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবদুল মালেক উকিল আগরতলায় পৌঁছেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে, গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু তাঁদের কোন নির্দেশই দিয়ে যাননি (জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৬-১৯৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-৫০০)। জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল হান্নান, খালেদ মোহাম্মদ আলী, লুৎফুল হাই সাচ্চু প্রমূখ নেতারাও একই কথা বলেছিলেন (প্রাগুক্ত)। তাজউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামও ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, মুজিবের আসল পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানতেন না। (শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, পৃষ্ঠা-৩৫৪)। অনেকে হয়তো বলবেন যে, সুন্দরী কাঠের লাঠি আর মরিচের গুঁড়া নিয়ে তৈরী হওয়ার জন্যতো বিচ্ছিন্নভাবে হলেও জাতির প্রতি আহবান জানানো হয়েছিলো। আজ থেকে প্রায় দেড়'শ বছর আগে যেখানে তীতুমীর বাঁশের কেল্লা গড়ে টিকতে পারেননি, সেখানে আজকের যুগে মেশিনগান-রকেট-ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করার পরামর্শ যে কি রকম উদ্ভট ও বালখিল্য ব্যাপার -তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক এন্থনী ম্যাসকারাহানস এরূপ প্রস্তুতি নিয়ে ইয়াহিয়া-ভূটোর সাজানো আলোচনায় অংশগ্রহণের ব্যাপারটিকে চূড়ান্ততম পর্যায়ের উজবুকী (Stupidity of the first order) বলে অভিহিত করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, বঙ্গবন্ধু স্বয়ং অপর বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক ডেভিড ফ্রষ্টের কাছে স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের জন্য তাঁর কোনই প্রস্তুতি ছিলনা (Bangladesh Documents, Vol II, Page 615)। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর এই সরল স্বীকারোক্তির পর এব্যাপারে আর কোন কথাই থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়। এককথায়, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পেছনে কোন দল বা ব্যক্তির কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ছিল না।

www.pathagar.com

০ বস্তুতঃ, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল ২৮ বছরব্যাপী পাকিস্তানী শাসকশোষক গোষ্ঠীর নির্মম উপনিবেশিক শাসন শোষণ, ৭১-এর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি, নিরস্ত্র-অপ্রস্তুত জনগণের ওপর হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা, বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম নরহত্যা-ধর্ষণ-ধ্বংসযজ্ঞ, তরুণ-ছাত্র-যুবক ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের তুলনাবিহীন বীরত্ব, হানাদারদের বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র জনগণের প্রতিরোধ সৃষ্টি, ভারতের স্বার্থ ও ভূমিকা ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এব্যাপারে আওয়ামী লীগেরই সাবেক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ এ আর মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেছেন, "The military crackdown of 25th March was the final and decisive turning in the history of Bengali nationalism. Until that date the nationalism that had developed and being represented by Awami League was seeking autonomy within the framework of Pakistan (History of Bangladesh : 1704-1971, Part I, Dr. A. R. Mullick and Syed Anwar Hossain, Page 572)। সুতরাং, এটা সুস্পষ্ট যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই এ অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্বশাসন চাইছিলেন এবং ইয়াহিয়া-ভূট্টো চক্রই হঠকারিতা ও ক্র্যাকডাউনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

০ বস্তুতঃ হানাদার বাহিনীর ক্র্যাকডাউনের পর প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তৎকালীন মেজর জিয়া, মেজর রফিক, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর মীর শওকত আলী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জলিল, মেজর নুরুজ্জামান, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী প্রমুখ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙ্গালী অফিসার ও জওয়ানরা। বাংলাদেশের ছাত্র-তরুণরা তাঁদের নেতৃত্বেই প্রথম সংগঠিত হন। পরবর্তীকালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং জেনারেল সুজন সিং উবানের পরিচালনায় গঠিত হয় বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (BLF) বা মুজিব বাহিনী। 'র' নিয়ন্ত্রিত এই বাহিনীর কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কিংবা প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী কিছুই জানতেন না; বা তাঁদের জানতে দেওয়া হতো না। এটি ছিল ভারতের একটি একান্ত নিজস্ব ও গোপন ব্যাপার। এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী টগবগে তরুনরাও গড়ে তুলেছিল দুর্বার প্রতিরোধ। এর মধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী। দলীয় নেতৃবৃন্দ ও আজকের উচ্চকণ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সংগে আদৌ সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাঁদের কেউ কেউ ভারতের নিরাপদ মাটিতে অর্থ, নেতৃত্ব ও

www.pathagar.com

ভারত সরকারের আনুকূল্য লাভের ধান্ধায় ব্যস্ত ছিলেন, আর কেউবা এখানে সেখানে চাকরী করেছিলেন মাত্র।

০ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা করুন বা না করুন, তিনিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ। তাঁর সুবিশাল ভাবমূর্তিই মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল, আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আপামর জনগণকে প্রেরণা আর সাহস যুগিয়েছিল।

০ ভারত যদি সেদিন পলায়নপর নেতাকর্মীদের আশ্রয় না দিত, তাহলে যে প্রস্তুতি মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদারদের ছিল, তাতে একমাসের মধ্যেই তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হানাদার বাহিনীর পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য হতো না। তারপর হয়তো বাঙালী সামরিক কর্মকর্তা জওয়ান ও নতুন তারুণ্যের সংমিশ্রনে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতো, দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের সূচনা ঘটতো, বাংলাদেশের আপামর জনগণ সত্যিকার অর্থেই মুক্তির স্বাদ পেতে পারতো। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে, আজ যাঁরা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব কুক্ষিগত করতে চাইছেন–তাঁদের অস্তিত্বতো নিঃসন্দেহে মুছে যেতো। এদিক থেকে, বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীনতার জন্য ভারতের ভূমিকা ছিল অসামান্য। কিন্তু ভারত সেদিন পলায়নপর বাঙ্গালীদের আশ্রয়, অস্ত্র ও পৃষ্ঠ- পোষকতা দিয়েছিল বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি কোন মমত্ববোধ থেকে নয়, –বরং ভারতেরই নিরংকুশ স্বার্থবোধ থেকে। হিন্দু ভারত প্রবল মুসলিম প্রতিপক্ষ পাকিস্তানকে ধ্বংস বা হীনবল করার এই সুযোগকে পুরোপুরি কজে লাগিয়েছিলো। বিজয়ের পরপরই প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট, পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল ইত্যাদি থেকে শুরু করে গঙ্গা–তিস্তা–ব্রহ্মপূত্রে বাঁধ নির্মাণ, বঙ্গসেনা ও শান্তি বাহিনী সৃষ্টি, অপারেশন পুশ ব্যাক, বাংলাদেশকে ভরতীয় পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণতকরন ইত্যাদিই ভারতের নির্মম সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার প্রমাণ।

০ মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে যখন প্রতিটি সেক্টরে সেক্টর ও ফোর্স সমূহের অধিনায়কদের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং হানাদারদের অনেকটা কাবু করে আনে, ঠিক তখনই নেতৃত্ব ও স্বার্থ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে– এই ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ভারত সরকার অক্টোবর মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে একটি ৭–দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই চুক্তির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১· যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তাপদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূণ্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

www.pathagar.com

২· বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয়সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতিবছর এসম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে (অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে বহু বছর থাকবে)।

৩· বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

৪· আভ্যন্তরীণ আইন–শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

৫· সাম্ভাব্য ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থকেবে।

৬· দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলাবাজার (ওপেন মার্কেট)–এর ভিত্তিতে। তবে বাণিজ্যের হিসাব হবে বছরওয়ারী এবং যার যা পাওনা তা ষ্টার্লিং –এ পরিশোধ করা হবে।

৭· বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

এই চুক্তির ফলে মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ভারত সরকার ও ভারতীয় জেনারেলদের করায়ত্তে এসে পড়ে এবং বাংলাদেশকে ভারতের সরাসরি উপনিবেশে পরিণত করার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যায়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর উপস্থিতিতেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং স্বাক্ষরদানের পরপরই সৈয়দ নজরুল মূর্চ্ছা যান (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সি· আই· এ" মাসুদুল হক, পৃষ্ঠা–৬৬)।

০ উপরোক্ত চুক্তি অনুযায়ীই ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী জেনারেল এ· এ· কে নিয়াজী ভারতীয় জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে, বাংলাদেশের কারো কাছে নয়। এই চুক্তির বলেই ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদস্যদের ভারতে আটকে রেখেছিল ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই চুক্তি বলেই হানাদারদের পরাজয়ের পর পর বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এক একজন ভারতীয় সামরিক অফিসারকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে। বিজয়ের পরপর ভারত যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নেয়, তখন এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিযোদ্ধাদের আর কিছুই করার থাকে না। এই চুক্তি বলেই ভারত বাংলাদেশ সরকারকে জিজ্ঞাসামাত্র না করে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩০০০ হানাদার সৈন্যকে অবলীলায় পাকিস্তানের কাছে ফিরিয়ে দেয়। এই চুক্তির জোরেই ভারত দিল্লীভিত্তিক যৌথ পাট কমিশন গঠনের মাধ্যমে পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে নেয়।

০ বঙ্গবন্ধু কখনোই এই ভারত কেন্দ্রিক, ভারত ভিত্তিক ও ভারত নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে পারেননি। এজন্যই তিনি সত্বরতার সংগে ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশের মাটি থেকে বিদায় করে দিয়েছিলেন (বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের দরুন তখন প্রতিবাদ না করলেও, পরবর্তী কালে বহু ভারতীয় নেতা, এমনকি সাবেক রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং পর্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন যে, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা ভারতের জন্য একটি মারাত্মক ভুল হয়েছিল)। এজন্যই বঙ্গবন্ধু অতি অপমানজনক ৭দফা চুক্তি মেনে চলতে রাজী হননি, যার ফলে পরবর্তীতে ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের সময় তুলনামূলক ভাবে কম অপমানজনক ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এজন্যই বঙ্গবন্ধু ২৫/৩/৭১ থেকে ১০/১/৯২ পর্যন্ত সময়ের কোন ঘটনার কথা কোন গণমাধ্যমে প্রচার হতে দেননি। এজন্যই তিনি কোনদিন যাননি মুজিবনগরে, কাউকে যেতেও দেননি সেখানে। এজন্যই তিনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীসভা থকে অপসারিত করেছিলেন। এজন্যই বঙ্গবন্ধু ভারতের ক্ষোভ-উষ্মার তোয়াক্কা না করে ১৯৭৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এবং এজন্যই তিনি ১৯৭৪ সালেই জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশের মাটিতেই ইন্দিরা গান্ধীর সমকক্ষ রাজকীয় সম্বর্ধনা প্রদান করেছিলেন।

০ আজ যে দল ও গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সমস্ত কৃতিত্ব আত্মসাৎ করতে চাইছে, এই দল ও গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় বা জেলা পর্যায়ে কোন নেতা বা সাংসদই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেননি। বাংলাদেশের অকুতভয় তরুণ ও জওয়ানরা যখন হানাদারদের সংগে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত, তখন এঁরা যুদ্ধের ময়দান থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে জীবনযৌবনকে উপভোগ করছিলেন এবং সম্পদ ও ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ব্যস্ত ছিলেন। সাহিত্যিক-চিত্র-পরিচালক জহির রায়হান এঁদের ভারতে অবস্থান কালীন যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রামাণ্য চিত্র তুলে আনেন এবং তাইই হয়ে দাঁড়ায় বিজয়ের দীর্ঘদিন পর (৩০/১/৭২) তাঁর অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তাঁর দালিলিক রীল সমূহও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শহীদ বুদ্ধিজীবিরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তাঁরা ঢাকা শহরেই স্ব স্ব বাসাবাড়ীতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছিলেন;

www.pathagar.com

অনেকে ক্লাস নেওয়ার জন্য রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতও শুরু করে দিয়েছিলেন। বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে তাঁদের মৃত্যু ছিল তাঁদেরই পরম নিশ্চেষ্টতা ও হানাদার নির্ভরতারই প্রায়শ্চিত্তের শামিল।

০ পাকিস্তানী হানাদার ও এখানে বসবাসরত অবাঙালীদের পরই যারা মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করেছিল, তারা হলো রাজাকার আলবদর বাহিনী। আর এই উভয় বাহিনীই ছিল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্ট এবং সরাসরি সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সরকারী সহায়ক বাহিনী। এইসব বাহিনীর পরিচালকরা বঙ্গবন্ধুর আমলেও উচ্চতর সরকারী পদে সমাসীন ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদও একথা তাঁর " ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টসঃ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড" গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

০ প্রথমে মূল যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ১৫০০ জন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সদস্যকে। পরে এই সংখ্যা কমিয়ে ১৯৫ জনে স্থির করা হয়। কিন্তু মূল যুদ্ধাপরাধীদের একজনেরও বিচার করা সম্ভবপর হয়না। কারণ ভারত বাংলাদেশের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কা না করে সিমলা চুক্তি মোতাবেক ওই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরধীসহ ৯৩০০০ জন পাকিস্তানী হানাদারকেই পাকিস্তানের হাতে প্রত্যার্পণ করে দেয়। মূল যুদ্ধাপরাধীদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী জারি করা হয় দালাল আইন এবং রাজাকার আলবদর ধরার নামে শুরু হয় ব্যক্তিগত শত্রুতা ও স্বার্থ উদ্ধারের তান্ডব। এই আইনে মোট ৩৭,৪৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৮৪৮ জনের বিচার হলে আদালত দেখতে পান যে, এদের ২০৯৬ জনই সম্পূর্ণ নির্দোষ। এটা বুঝতে পেরে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ১৯৭৩ সালের ৩০ শে নভেম্বর দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত সকলকে বিনাশর্তে মুক্ত করে দেন। দালাল আইন বাতিল হয়ে যায়।

০ ১৯৭০–এর নির্বাচনের বিজয়ের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ। কিন্তু তারা না তৈরী করে মুক্তি যোদ্ধাদের কোন তালিকা, না তৈরী করে শহীদদের তালিকা। বরং তারা জেনারেল ওসমানী ও স্বরাষ্ট্র সচিব তসলিম উদ্দীন আহমদ স্বাক্ষরিত মুক্তিযুদ্ধের সনদ সমূহ বিলি করে দেয় মুড়িমুড়কির মতো, টোটকা ঔষধের বিজ্ঞাপনের মতো। সবচেয়ে বড়ো কথা, পৃথিবীর প্রতিটি বিপ্লব বা রক্তাক্ত সংগ্রামের পর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তিকরণ অনিবার্য হলেও, বাংলাদেশে আদৌ তা করা হয় না। মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশে কি করবে তার কোন তোয়াক্কা না করে সেই উপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ও প্রতিরক্ষা কাঠামোকেই পুনর্বহাল করা হয়। ফলে

www.pathagar.com

দিগদর্শনহীন মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ সম্পদ আহরনে নেমে পড়ে, কেউ সামান্য জীবিকার সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরতে থাকে, কেউ মুটে-মজুর রিক্সাচালকে পরিণত হয়, কেউ যোগ দেয় সরকার বিরোধী রাজনীতিতে। জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত মুক্তি যোদ্ধাদের অনেকেই হয়ে পড়ে অসহায় বেকারত্বের শিকার। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই আচরণ রাজাকার-আলবদরদের ভূমিকার চাইতেও ছিল অনেক বেশী ক্ষতিকর। বিশ্বের ইতিহাসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এ রকম আচরণের দ্বিতীয় কোন নজীর নেই।

০ বিজয়ের পরপরই মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদাররা পরিত্যক্ত সমস্ত শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকান-পাট, বাড়ীঘর, গুদাম ইত্যাদি দখল করে নেয়। শুরু হয় লুটপাট ও পারমিট বাজীর এক বর্বর অধ্যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যে হাজার হাজার কোটি টাকার রিলিফ আসে, তার শতকরা ৮০ ভাগই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আত্মসাৎ করে, বাংলাদেশের পাট ভারতে পাচার করে শূন্য গুদামের পর গুদামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতে থাকে। এই নৈরাজ্য ও লুটপাটের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। বিশ্বের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে এসব দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও লুটপাটের খবর। বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হন, "চাটার দল সব খেয়ে শেষ করে ফেলেছে"। হেনরী কিসিঙ্গার ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তলাহীন ঝুড়িতে"। এভাবে জন্মলগ্নেই বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর যে আঘাত হানা হয়, তার রেশ আজও কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। কবে যে হবে তাও কেউ বলতে পারে না।

০ এসব লুটপাট ও আত্মসাতের বিরুদ্ধে যাতে কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করতে না পারে তার জন্য গঠন করা হয় লাল বাহিনী, রক্ষী বাহিনী (৭·৩·৭২) প্রভৃতি গেষ্টাপো বাহিনী। এদের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয় প্রতিবাদী মুক্তিযোদ্ধারা। এসব বাহিনী ও সরকার দলীয় গুন্ডাদের হাতে জাসদ ও সর্বহারা পার্টির হাজার হাজার নেতা কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়। পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের সহযোগী রাজাকার আলবদর বাহিনীর হাতে যে পরিমাণ মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়,- এসব গেষ্টাপো বাহিনীর হাতে নিহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল তার দ্বিগুণেরও বেশী। এসব হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে কোন থানাকে কোন মামলা নিতেও দেওয়া হয়নি।

০ মুজিববাদের সংগে বঙ্গবন্ধুর কোনই সম্পর্ক ছিল না। এজন্য তিনি কোনদিনই মুজিববাদ সম্পর্কে কোন কথা বলেননি। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তি অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের উদ্ভট সংমিশ্রণে মুজিববাদ তৈরী করেন এবং এর দায়দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর ওপর চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হন। অবশ্য

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধুকে তুষ্ট করার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাওয়ায়, "মুজিববাদ" এর এককালের উন্মত্ত ধারকবাহকরাও আজ আর মুজিববাদ সম্পর্কে কোন কথা বলেন না। এখন তাঁরা বুশ-ক্লিন্টনীয় মুক্ত অর্থনীতিরই অগ্রসৈনিক।

০ বঙ্গবন্ধুর একমাত্র দুর্বলতা ছিল, তিনি তাঁর দলের নেতা কর্মীদের আপন প্রানের চাইতেও বেশী ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসার জন্যই তিনি তাদের যাবতীয় অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর হতে পারেননি। তাঁর এই উদারতাই পরিণত হয়েছিল তাঁর নিমেসিসে।

০ দলীয় নেতা কর্মীদের চক্রান্ত, শ্বেত সন্ত্রাস ও লুটেরা কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিতে ইতিমধ্যেই অনেক খানি ধ্বস নেমে এসেছিল। কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন কায়েমী স্বার্থবাদীরা লুটপাটের অবাধ অধিকার, লুটপাটলব্ধ সম্পদের সুরক্ষা এবং ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে চিরকালের উদার গণতন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে কায়েম করিয়ে নিয়েছিল একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থা, যা ছিল হিটলার-মুসোলিনীর নিরংকুশ নাৎসী স্বৈরাচারেরই হুবহু প্রতিকৃতি। এর শ্লোগানও ছিল ঠিক তদ্রুপ। এই বাকশাল কায়েমের মাধ্যমেই সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের সদস্যদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে বাধ্য করা হয়। এই বাকশাল কায়েমের মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জনগণের মৌলিক অধিকার- মতামত প্রকাশের অধিকার, সংগঠনের অধিকার, দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের অধিকার। এই বাকশাল কায়েমের মাধ্যমেই তারা মহাপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তির কফিনে এঁটে দেয় সর্বশেষ পেরেক।

০ এই পটভূমিতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত ভক্ত প্রগতিবাদী-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র দাবীদার নেতা-বুদ্ধিজীবীরা তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ন এলাকায় এই নির্মম হত্যার প্রতিবাদে ৫ জন লোকের একটা মিছিল পর্যন্ত বের করে না। তোফায়েলের নেতৃত্বাধীন রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একটা বুলেট পর্যন্ত ছোঁড়ে না। বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত ভক্ত-অনুসারীরা বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ীর সিঁড়ির ওপর ফেলে রেখে নতুন সরকারে মন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণ করে।

০ খোন্দকার মোশতাক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দল ও মন্ত্রীসভারই সদস্য। খোন্দকার মোশতাকের মন্ত্রীসভার প্রতিটি সদস্যও ছিলেন আওয়ামী লীগ-বাকশালেরই সদস্য। তাঁর পার্লামেন্ট ছিল- ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধুরই পার্লামেন্ট। এক কথায় খোন্দকার মোশতাকের সরকার ছিল সর্বাংশেই আওয়ামী লীগ-বাকশালেরই

www.pathagar.com

সরকার। ওই সরকারের সদস্য ও সহযোগীদের অনেকে আজো আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বে আসীন। ওই সময়কার স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল, যিনি বঙ্গবন্ধুকে ফেরাউন বলে অভিহিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে আওয়ামী-বাকশালীরা সেই আবদুল মালেক উকিলকেই সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করে। ওই সরকারের সদস্য/সহযোগী আবদুল মান্নান মহিউদ্দিন আহমদ প্রমূখ আজো আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা।

০ বঙ্গবন্ধুর প্রতি একচ্ছত্র ভক্তির দাবীদাররাই ১৯৭৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর প্রণয়ণ ও জারি করেন কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স, যাতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারে না হয় এবং তাঁদের সম্পদ ও ক্ষমতা নিরাপদ ও অব্যাহত থাকে।

০ বাংলাদেশে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র দাবীদার, তাঁদের মৌল বৈশিষ্ট্য হলো ক) অন্ধ ইসলাম বিদ্বেষ খ) অন্ধ ভারত প্রীতি গ) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র ধারক হিসাবে নিজেদের জাহির ঘ) অশ্লীল সংস্কৃতির অনুসৃতি এবং ঙ) বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অতুলনীয় ভাবমূর্তিকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার।

০ এঁদের যুক্তি হলো ভারত ও ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যেহেতু উগ্র ইসলাম বিরোধী, সেহেতু উগ্র ভারত ও ভারতীয়রা যা কিছুই করে, তাইই প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ ও সংস্কৃতির প্রতিমূর্তি। এই দৃষ্টিকোন থেকেই তাঁরা গত ৪৬ বছরে ভারতে অনুষ্ঠিত প্রায় ১৪০০০ টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা, কয়েক লক্ষ মুসলমান হত্যা, হাজার হাজার মসজিদ মাযার জবরদখল, মুসলমানদের চাকরী ব্যবসা, জমি ইত্যাদি থেকে নির্মমভাবে হঠিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বঙ্গসেনা ও শন্তিবাহিনী পোষণ ও অপারেশন পুশ ব্যাক, বাংলাদেশকে পানি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করনের পরিকল্পনা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতের প্রতি সি আর দত্তবাবুদের আহবান ইত্যাদির প্রতি অন্ধ ও উগ্র সমর্থন প্রদান করেন।

০ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ সমাজতন্ত্রের ধ্বংসের পটভূমিতে ইসলামই বিশ্বের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সার্বিক জীবনাদর্শ বিধায়, আজ ইসলামই হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আঘাতের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে এই আঘাত হানার সর্বাত্মক দায়িত্ব নিয়েছে স্বাধীনতার একচ্ছত্র দাবীদার এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী-প্রগতিবাদীরা। তারা আজ আধ্যাপক গোলাম আযমকে উপলক্ষ হিসাব দাঁড় করিয়ে পর্যায়ক্রমে এদেশের সমস্ত ইসলামী শক্তির মূলোৎপাটনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ক্রুসেডে নেমেছে। তারা ক্রমাগত প্রচার করে চলেছে যে, ইসলামই যত নষ্টের গোড়া, ইসলামপন্থীরাই দেশ ও জাতির যাবতীয় দুর্দশার জন্য

www.pathagar.com

দায়ী (যদিও কুরআন সুন্নাহ পন্থীরা কখনোই রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল না) ইসলাম মৌলবাদী এবং ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। বস্তুতঃ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আদৌ ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না। এই যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর ২৪ বছরব্যাপী উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ ছিল জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের মুক্তির যুদ্ধ,-যা ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়যুদ্ধ। এ জন্যই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদে-মাযারে-খানকায় হানাদারদের ধ্বংস ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের জন্য দোয়া মোনাজাত করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব নেতা-বুদ্ধিজীবী যুদ্ধের ময়দানের ধারে কাছেও ছিলেন না, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের সংগেসংগে যাঁরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিলেন, সরকারী উদারতা-দুর্বলতার সুযোগে তাঁরাই আজ হঠাৎ ব্যাঘ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্ব লুণ্ঠন করার জন্য ইসলামের ওপর আঘাত হানার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

০ এইসব উন্মত্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জানেন না এবং জানার কোন তোয়াক্কাই করেন না যে, ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এঁরা জানেন না যে, কুরআন-সুন্নাহয় রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির মূলনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে এবং তা পুংখানুপুংখরূপে মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক, (আবার বলছি, বাধ্যতামূলক)। এঁরা এটাও জানেননা যে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) শুধু নবীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে একজন রাষ্ট্র প্রধান, সেনাপতি, সমরবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, আইনদাতা ও বিচারক এবং তাঁর সকল দিকের অনুসরণও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। এটা যাঁরা মানবেন না তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবেন। স্বয়ং আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (দঃ) যেখানে রাষ্ট্র সমাজনীতি অর্থনীতি আইন ইত্যাদিকে ঈমান আক্বিদার সংগে পরস্পর গ্রথিত ও অবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, সেখানে এঁরা বলছেন, ইসলামকে রাজনীতিতে টেনে আনা যাবে না। এরকম কথা কোন মুসলমান কখনোই বলতে পারেন না।

০ ইসলামে রয়েছে ইজতিহাদ, ইজমা ও কিয়াসের ব্যবস্থা। যার ফলে যে কোন দেশে যে কোন যুগে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির যে কোন স্তরে কুরআন সুন্নাহর শাশ্বত মর্মবাণীর প্রায়োগিক রূপ খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর। বিশ্বের অন্যকোন মতবাদ বা ইজমেই এমন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। এই গুণের জন্যই ইসলাম, মূলনীতির কোন রদবদল ব্যতিরেকেই, ১৪০০ বছরেরও বেশী সময় যাবৎ অবিকৃতভাবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছে; যেখানে অন্য কোন মতবাদ তার মূল স্বকীয়তা নিয়ে অর্ধশতাব্দীও টিকতে পারেনি। অথচ এঁরা কালোত্তর্ণী এই ইসলামকেই

www.pathagar.com

বলছেন প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী এবং যেসব মতবাদ ও চিন্তাধারা কালের ধোপে দুমড়ে ধ্বসে গেছে বা যাচ্ছে, সেগুলোকেই বলছেন প্রগতিশীল। বস্তুত এঁরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু তো জানেনই না; 'প্রগতি' প্রতিক্রিয়া, মৌলবাদ ইত্যাদির সংজ্ঞাও জানেন কিনা সন্দেহ।

০ এঁরা আরও জনেন না যে ইসলামই বিশ্বের একমাত্র যথার্থ প্রগতিশীল, সাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, সমস্ত সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর মালিকানাধীন সম্পদে আল্লাহর সকল বান্দার সমান অধিকার; মানুষকে শোষণ করার কোন এক্তিয়ার কোন মানুষের নেই। এই শোষণমুক্ত ইসলামী সমাজের মডেল হলো রাসূলুল্লাহ (দঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদার আমলের সমাজ ব্যবস্থা। আল্লাহ বলেছেন, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর আধিপত্য– তথা জাতির ওপর ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর একনায়কত্ব/স্বৈরাচার ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অমুসলমানের ওপর কোন প্রকার নিপীড়ণ, শোষণ বা হয়রানি সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিরুদ্ধ। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা এবং যে বিচারব্যবস্থায় ধনী বা প্রতিপত্তিশালীরা ধন বা প্রভাবের বিনিময়ে আপীলের সুযোগ ও আদালতের রায় কিনে নিতে পারে–সেই বিচার ব্যবস্থা ইসলামে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। সুতরাং এটাই বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত যে, যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই না জেনে এবং জানার কোন তোয়াক্কাই না করে অন্ধভাবে ইসলামের ওপর আঘাত হেনে চলেছেন এবং অন্ধভাবে ভারত ও ভারতীয়দের যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের এই অন্ধত্বতারই নাম হলো প্রতিক্রিয়াশীলতা। এই অন্ধত্বতারই নাম হলো মৌলবাদ। বস্তুতঃ কুরআন–সুন্নাহর সত্যিকার অনুসারীরা কখনোই "মৌলবাদ" শব্দের উৎপত্তিগত অর্থে মৌলবাদী নন। বরং অন্ধ ইসলাম বিদ্বেষীরাই প্রকৃত পক্ষে এই অর্থে মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল। আর যদি মৌলবাদের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় এবং কোন জীবনদর্শনের মূলধারা বা মূলনীতির অনুসরণকেই "মৌলবাদ" বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে ইসলামপন্থীরা অবশ্যই মৌলবাদী। একই বিচারে, কার্লমার্ক্সের মূল মন্ত্রের অনুসারীরাও মার্কসীয় মৌলবাদী, মুক্ত অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরাও পুঁজিবাদী–সাম্রাজ্যবাদী মৌলবাদী এবং ভারত ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধ ভক্তেরা ভারতপন্থী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী মৌলবাদী।

০ কোন আদর্শকে বাস্তবায়িত করার কর্মসূচীকে ওই আদর্শ নিয়ে ব্যবসা– একথা বলা যায় না। যেমন কেউ যদি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের জন্য ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বা লিংকনীয় গণতন্ত্রই সর্বোত্তম এবং সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তাহলে তিনি বা তাঁরা গণতন্ত্র নিয়ে ব্যবসা করছেন একথা বলা

www.pathagar.com

যাবে না। একই বিচারে যাঁরা কুরআন সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমে বদ্ধপরিকর,- তাঁরা কখনোই ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছেন না। বরং ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছেন তাঁরাই, যাঁরা ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের ওপর সর্বসময় বেপরোয়া আঘাত হানেন অথচ নির্বাচন এসে পড়লেই জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ধর্মের কথা বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ" জাতীয় শ্লোগান ও জিগির তোলেন। ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করেন তাঁরাই, যাঁরা অষ্ট প্রহর ইসলামকে নিয়ে বিদ্রুপ-উপহাস করেন, নামায-রোজাকে ব্যঙ্গ করেন, অথচ রামযান মাস এলেই "ইফতার পার্টির" প্রতিযোগিতা শুরু করেন। মার্কসবাদের অনুসরণ যদি মার্কসবাদকে নিয়ে ব্যবসা না হয়, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসরণ যদি ওই গণতন্ত্রকে নিয়ে ব্যবসা না হয়, তাহলে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র-সমাজ- অর্থনীতির দর্শনের অনুসরণও ইসলাম বা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা হতে পারে না।

০ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমের বিষয়ে আলোচেনার সর্বোত্তম স্থানই হলো আল্লাহর ঘর বা মসজিদ। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে নববী থেকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, বিচার কার্যাদি সমাধা করেছেন। খুলফায়ে রাশেদাও করেছেন একই পথের অনুসরণ। সুতরাং মসজিদে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় কোন প্রতিবন্ধকতা আরোপের অধিকার কোন মানুষের নেই।

০ একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নিযুত জোয়ান ছাত্র জনতা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ৩০ লক্ষ না হলেও লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিল তাদের প্রাণ। প্রায় ৫ লক্ষ মা বোন দিয়েছিল তাদের ইজ্জত। গোটা জাতি রুখে দাঁড়িয়েছিল হানাদারদের বিরুদ্ধে। এতো অল্প সময়ে এতো বেশী প্রাণ আর রাক্তদানের দ্বিতীয় কোন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। এই তুলনাবিহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং রক্ত ও প্রাণদানের লক্ষ্য ছিল শোষণ, বৈষম্য, অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতির কবল থেকে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মুক্তি। এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের একক ও একমাত্র চেতনা। কিন্তু এবিষয়ে কারুরই দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই যে, স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ২২ বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের এই সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও চেতনা অর্জিত হয়নি। বরং আপামর জনগণের অবস্থার আরও শোচনীয় অবনতি ঘটেছেঃ শোষণ, বৈষম্য সন্ত্রাস নৈরাজ্য দুর্নীতি আজ সমগ্র জাতিকে গ্রাস করেছে, মূল্যবোধকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, ঝাঁঝরা করে দিয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রশাসনিক ইনস্টিটিউশনকে। আর জাতির এই চরম বিড়ম্বনার মূল্যে গড়ে উঠেছে একচেটিয়া সম্পদ ও ক্ষমতা ভোগকারী এক শক্তিশালী মাফিয়াচক্র। গত ২২ বছরের

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এতোদিন যাবৎ যে ধরনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চলে এসেছে, তার মাধ্যমে সমগ্র জনগণের সার্বিক মুক্তি অর্জন কোনদিন কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশে আজ যে চূড়ান্ততম আদর্শ, দিগদর্শন ও মূল্যবোধের সংকট,-এই সংকট থেকে জাতিকে রক্ষার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও আইন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। একমাত্র এই ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমেই সম্ভব শোষণ-বৈষম্যের মূলোৎপাটন করা, অমুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা (ধর্ম নয়) নিশ্চিহ্ন করা, স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সুষম বন্টন সুনিশ্চিত করা, ঘুষ-দুর্নীতি -ভেজাল-খুন-রাহাজানি, সন্ত্রাস-অশ্লীলতা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির মূলোৎপাটন করা, সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা এবং এভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চেতনাকে ১২ কোটি মানুষের জীবনে মূর্ত-করে তোলা, লাখো শহীদের জীবন এবং নিযুত মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করা। এর কোনই বিকল্প নেই।

অথচ আপনারা যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী (অর্থাৎ ধর্মহীনতাবাদী) এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবীদার, তাঁরা নিশ্চয়ই সমস্বরে বলবেন যে, ওপরের সমস্ত কথাগুলোই মিথ্যে। বস্তুতঃ বাস্তবে যা ঘটেছে বা ঘটছে তা কখনোই আপনাদের বিচারে সত্যিকার ইতিহাস নয়। মহাকবি বাল্মিকীর রামায়ন রচনার মতো,-আপনাদের কাছে সত্যিকার ইতিহাস হলো সেটাই,-যেটা আপনাদের স্বার্থ, গোঁয়ার্তুমি ও অহং এর--অনুকূল, তা আদৌ বাস্তব কি অবাস্তব তাতে কিছুই যায় আসেনা।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমাদের আগে পরে পৃথিবীর বহুদেশ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বহুদেশে সম্পন্ন হয়েছে বিপ্লব। কিন্তু এইসব স্বাধীনতা ও বিপ্লবে দলবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা নিয়ে কখনোই কোন মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়নি। কারো পছন্দ হোক বা না হোক, আমেরিকার স্বাধীনতা থেকে শুরু করে মেসিডোনিয়ার স্বাধীনতা, লেনিনের রুশ বিপ্লব থেকে শুরু করে ইমাম খোমিনীর ইসলামী বিপ্লব পর্যন্ত কোন ইতিহাস নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষ কোন দিনই কোন দ্বিমত পোষণ করেনি; কারণ বাস্তবে যা ঘটেছিল তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের ইতিহাস। দ্বন্দ্ব শুধু সৃষ্টি হয়েছে আপনারা যে ইতিহাস চাপিয়ে দিতে চাইছেন, সেই ইতিহাস নিয়ে। স্বাধীনতার ২২ বছর পরও আপনাদের সীমিত গন্ডীর বাইরের কাউকেই গ্রহণ করানো সম্ভবপর হয়নি আপনাদের "ইতিহাস"। কারণ আপনারা যেটাকে ইতিহাস বলে চালাতে চাইছেন, দেশের অন্ততঃ ৭৫% মানুষের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে তা নিতান্তই "উদ্দেশ্যমূলক গল্প"।

কিন্তু জাতিতো প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই বিভ্রান্তির বোঝা বহন করতে পারে না। ইতিহাসের স্বার্থে, প্রজন্মের স্বার্থে এবং সর্বোপরি নিরংকুশ সত্যকে (Absolute truth কে) প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থেই এর একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়া অত্যাবশ্যক। নির্ণীত হওয়া অত্যাবশ্যক ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাস্তবিকই কোন দল এবং কোন ব্যক্তি কি ভূমিকা পালন করেছে, কারা বিজয়ের পর হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছে, কারা সৃষ্টি করেছে ৭৪-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, কারা লুটপাট-আত্মসাতের মাধ্যমে জন্মলগ্নেই ধ্বংস করে দিয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত, কারা সশস্ত্র বাহিনীসমূহের কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে এবং রাজনীতিতে অংশ নিতে বাধ্য করেছে, কারা একদলীয় সরকার কায়েম করেছে, কারা ভারতের সংগে ৭১-এ সম্পাদন করেছিল চূড়ান্ততম অধীনতামূলক ৭-দফা চুক্তি, কারা প্রণয়ন ও জারি করেছিল বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স, কারা ২২ বছর যাবৎ বাংলাদেশের স্বার্থকে বলি দিচ্ছে বিদেশী স্বার্থের যুপকাষ্ঠে, কারা দেশের ৮৭% মানুষকে ঠেলে দিয়েছে করুণ মানবেতর জীবন যাপনে, কারা বঙ্গসেনা ও শান্তিবাহিনীকে সমর্থন ও উৎসাহ যোগাচ্ছে, কারা উজানে একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মরুভূমি করার চক্রান্তে নীরব মদদ যোগাচ্ছে, কারা সত্যিসত্যি ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছে, কারা বঙ্গবন্ধুর নাম ও ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করছে নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের বর্ম ও হাতিয়ার হিসাবে। আজ চিহ্নিত হওয়া অপরিহার্য, কারা আল্লাহ-রাসুল (দঃ) এর পক্ষে এবং কারা বিপক্ষে।

বস্তুতঃ, যে পর্যন্ত ইসলামপন্থী ও ইসলামবিরোধীদের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া না যাবে, সে পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি কিছুই স্বচ্ছ হবে না; ১২ কোটি মানুষ মুক্ত হবে না শোষণ- বৈষম্য-প্রবঞ্চনা-ভন্ডামী, সন্ত্রাস ইত্যাদির কবল থেকে; দেশ মুক্তি পাবে না আগ্রাসন ও স্নায়ুযুদ্ধের প্রক্রিয়া থেকে; বাস্তবায়িত হবে না মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা, শোধ হবে না মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রাণ আর রক্তের ঋণ।

আমরা আশা করি, দেশ ও জাতিকে যাবতীয় বিভ্রান্তি ও সংশয়ের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আপনারা, অর্থাৎ প্রগতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের একচ্ছত্র কৃতিত্বের দাবীদাররা কোন প্রকার ধানাইপানাই না করে, ধান ভানতে শিবের গীত না গেয়ে, ক্যাটেগরিক্যালী উপরোক্ত ৬১ টি প্রশ্নের সরাসরি জবাব বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের সামনে তুলে ধরার সৎসাহস প্রদর্শন করবেন।

আমরা আরো আশা করি, সর্বপ্রকার শঠতা, ভন্ডামী, দ্বিরাচার এবং আড়াল ত্যাগ

www.pathagar.com

করে আপনারাও আপনাদের সত্যিকার অবয়ব স্বচ্ছ সুস্পষ্টভাবে জনতার আদালতে তুলে ধরবেন। তারপর, জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে, শতকরা ৮৭ জন মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে আল্লাহ ও তার রাসুল (দঃ) কর্তৃক আদিষ্ট ও প্রদর্শিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে, নাকি কুরআন-সুন্নাহবিরোধী তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ (অর্থাৎ ধর্মহীন) রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাই কায়েম হবে; জনগণই স্থির করবে ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ১২ কোটি মানুষকে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করে যে ধরনের রাজনীতি ইজম ইত্যাদির এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে-সেই এক্সপেরিমেন্টের প্রক্রিয়াই বহাল থাকবে, নাকি বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণ শাশ্বত, নিশ্চিত, সার্বিক মুক্তির পথ খুঁজে নেবে।

পরিশিষ্ট

সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আর·এস·এস·) আরব বিশ্বে কর্মরত হিন্দুদের মধ্যে হিন্দিতে লিখিত দু'টি লিফলেট বিলি করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

১· পৃথিবী থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা,

২· মহা-ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করা এবং

৩· কা' বা শরীফকে মহাদেবের মন্দিরে পরিণত করা।

"রামজীর জয় হোক" শিরোনামে প্রকাশিত লিফলেটে বলা হয়েছে, ৬ই ডিসেম্বরের (বাবরী মসজিদ ধ্বংসের দিন) পরে এখন শুধু ভারতে নয়,সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে আরব ভূমিতে পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের লক্ষ্য অর্জন করার সময় এসেছে। দেশ ও 'বিদেশে'র সব বন্ধু-বান্ধব আমাদেরকে সর্বতোভোবে সহায়তা করেছেন ঘৃণ্য মুসলমানদের মসজিদের হাত থেকে দেবতা রামের পবিত্র জন্মভূমিকে উদ্ধার করার মহান কাজে। একইভাবে আমরাও বিদেশের সেসব বন্ধুদের ইসরাইলকে মহা ইসরাইলে পরিণত করার জন্য এক হয়ে শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করতে হবে।

আরব দেশগুলোতে অবস্থানরত আমাদের সব হিন্দু ভাইদের কাছে ইতিমধ্যেই 'প্রয়োজনীয় পরামর্শ' সম্বলিত সার্কুলার দলের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। এতে যে কর্মসূচীর উল্লেখ রয়েছে তা কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করে হুবহু বাস্তবায়নের জন্য আমরা সকল রামভক্তের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। নিম্নবর্ণিত উপদেশগুলো চরম সতর্কতার সাথে এবং যথাশীঘ্র পদক্ষেপের মাধ্যমে মেনে চলতে হবেঃ

১। আরব দেশে অবস্থানকালে আমাদের দলের প্রতীক বা নাম কোথাও ব্যবহার করবেননা।

২। দলের সব সার্কুলার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সব ভাইয়ের কাছে পৌঁছাতে হবে।

৩। আরব জগতে কর্মরত সব ভারতীয় মুসলমানের নামের তালিকা তাদের চাকরি সম্পর্কিত বিশদ তথ্যসহ 'এরিয়া ক্যাডার চীফ' কে সরবরাহ করুন। এদের উপর কড়া নজর রাখুন। আমাদের স্বার্থবিরোধী কিছু ঘটলে কিংবা দরকারী তথ্য পেলে· তা ইতিমধ্যেই আরব দেশগুলোতে নিয়োজিত আমাদের 'ক্যাডার চীফ'কে জানিয়ে দিন।

৪। স্থানীয় আরবদের সাথে গভীর সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব বজায় রেখে ওদের দূর্বলতার পুরো সুযোগ নিন। সুন্দরী নারী,মদ ও অর্থ হচ্ছে দুশমনের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সেগুলো ব্যবহার করুন।

www.pathagar.com

৫. আরব জগতে অবস্থানকালে আপনার কর্মস্থল, বাসগৃহ, দোকান, অফিস, সর্বত্র রামের মূর্তি (ছোট বা বড়) স্থাপন করুন। তা সম্ভব না হলে অন্ততঃ রামের একটি ছবি রাখুন। কারণ আরব হচ্ছে রামজীর আসল আবাসভূমি। ১৪০০ বছর আগে ঘৃণ্য এসব মুসলিম তাকে এখান থেকে হটিয়ে দিয়েছিল।

মানে রাখবেন, চলতি শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই রাম রাজত্বের স্বপ্ন এং বৃহত্তর ইসরাইলের আকাংখা পূরণ হওয়া উচিত। এসময়ের মধ্যেই ভারত ও আরব দেশগুলোকে ঘৃণ্য মুসলমান জাতি, তাদের মসজিদ, সংগঠনসহ সবকিছু থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। শুধু রামের ভক্তরাই ভারত ও আরবে গর্বের সাথে বাস করার অধিকার রাখে। অন্যরা, বিশেষ করে জঘন্য মুসলমানরা, কেবল রামের ও রামভক্তদের ক্রীতদাস হিসেবেই বাঁচতে পারে।

মহাপ্রভু রামের জয় হোক।

আমাদের মাতৃভূমির জয় হোক।

"রক্ষাকর ধর্ম রক্ষা করবে" এই প্রচারপত্রটির অন্ততঃ ১৫টি কপি তৈরী করে প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে পৌঁছে দিতে বলে দেয়া হয়েছে।'

এই লিফলেটে বলা হয়েছে, প্রতিটি হিন্দুর জেগে ওঠার সময় এসেছে গরুখোর মাংসভূক বন্য পশু শয়তানদের ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে শুধু নির্দোষ মানুষকে হত্যা করতে এবং গণহত্যা চালাতে। তারা শত শত বছর ধরে নিজ মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে খুন করছে। শিশু কন্যাকে জীবিত বর দেয়া ইসলামের নির্দেশ। মুসলমানরা আবার হিন্দু ধর্ম ও ভারতকে ধ্বংস করার মতলবে ইসলামের নামে গোপনে তৈরী হয়েছে। তাদের সাহস খুব বেশী। তাদের শয়তানী শ্লোগান 'আল্লাহ আকবর' আমাদের দেশে ধ্বনিত হচ্ছে, মহান হিন্দুধর্মকে বাঁচানোর জন্য এদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য তাদের পিষে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করতে হবে আমাদের মাতৃভূমি ভারতের উপর আবার তারা বদনজর ফেলেছে। একারণে তাদর চোখ নষ্ট করে দিতে হবে।

এসব পশুর ভয়ে আমরা কি ঘরে চুড়ি পরে মেয়েদের মতো বসে থাকবো? হিন্দুরা কি নপুংশক? না। শিবাজী ও মহারানা প্রতাপের মহাপবিত্র রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত। আমরা এসব মহাপরুষের সন্তান। হিন্দু বাবার রক্ত দেহে থাকলে, হিন্দু মায়ের স্তন্য পান করলে মহাপবিত্র ধর্মযুদ্ধের জন্য হিন্দুরা প্রস্তুত হও। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামের সম্পূর্ণ পতন ঘটাতে হবে। অতএব, ওঠো· জাগো। "হর হর মহাদেব" শ্লোগান দিয়ে জেগে ওঠো। ইসলামী পশুদেককে, গরুখোর গোষ্ঠিকে আক্রমণ করে পাইকারীহারে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করে দাও। তাহলেই কেবল রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে"

আশাকরা যায়, হিন্দুদের এই 'মহান' উদ্যোগে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষাত বাদী ও স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের একক দাবীদাররা যথেষ্ঠ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করবেন এবং ইসলাম ও মুসলমাদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে সমর্থ হবেন। আহমদ শরীফ-তসলিমা নাসরিন-কবি শামসুর রাহমানরাও ইসলামের বিরুদ্ধে আরও অশ্লীল, আরও শাণিত করতে পারবেন তাঁদের কলম। প্রত্যক্ষ্য ও সাহসী উদ্যোগ নিতে পারবেন বাংলাদেশের মসজিদ মাদ্রাসা সমূহ ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য, বাংলাদেশের মাটি থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে দেওয়ারজন্য।

কিন্তু ইসলামের অনুসারীরা কি করবেন? তাঁদের কি কোনো ঈমানী দায়িত্ব নেই?

———0———

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

লেখক হারুনুর রশীদ ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। বর্তমানে ব্যবসা ও লেখালেখি নিয়েআছেন।

জনাব হারুনুর রশীদের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলোঃ–

১· সাধারণ সম্পাদকঃ চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রলীগ (অবিভক্ত), ১৯৬৩–৬৪ ২· আহবায়ক (কেন্দ্রীয়)ঃ গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৯৬৫ (এর অন্যান্য সদস্য ছিলেন মাহবুব উদ্দীন আহমদ, শহীদুল হক মুন্সী, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এবং সিরাজুল আলম খান) ৩· ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (অবিভক্ত), ১৯৭৪–৭৮ ৪· সদস্য, ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, বিপ্লবী সংগঠন (নাম দেওয়া হয়নি), যা জাসদ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিকলীগ, গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সর্বোচ্চ কমিটি ছিল। এই কমিটির অপর চার জন সদস্য ছিলেন মোহাম্মদ শাজাহান (বর্তমানে মৃত), হাসানুল হক ইনু, মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি) ও খায়ের এজাজ মাসউদ। সিরাজুল আলম খান ও ডঃ আখলাকুর রহমান এই সর্বোচ্চ কমিটির বিকল্প সদস্য ছিলেন (১৯৭৪–৭৭) ৫· কো–অর্ডিনেটর ঐ (১৯৭৬–৭৭) ৬· পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) ১৯৮০–৮৩) ৭· বি· এন· পি· এর ষ্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রকাশিত "দেশ, জাতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সংগঠন প্রসংগে" এবং "ক্যাডার প্রসংগে"–এর লেখক। মূলতঃ এরই ভিত্তিতে তৎকালীন মন্ত্রী–এমপি–ও নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা হয়েছিল। ৮· চেয়ারম্যান, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংস্থা (১৯৮১–৮৪)৯· বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব ১০· রাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণে চীন ও উত্তর কোরিয়া সফর। রাশিয়া সহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশ তিনি সফর করেছেন। ১১· ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশীয় জুচে সম্মেলনে সভাপতিত্বকরণ। ১২· সমন্বয়কারী, রাষ্ট্রপতি জিয়া কর্তৃক গঠিত অর্থ, শিল্প বাণিজ্য, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রশাসনের ওপর গঠিত কমিটিসমূহ (তৎকালীন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ ও দলীয় নেতৃবৃন্দ এসমস্ত কমিটির সদস্য ছিলেন) ১৩· সম্পাদক, সাপ্তাহিক আমার দেশ (জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও এরশাদ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত) ১৪· তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তক ঃক· বামপন্থীদের ভ্রান্তি ও বাংলাদেশের বিপ্লব খ· বাংলাদেশের মৌল সমস্যা ও সমাধানের রূপরেখা গ· ইসলামী রাষ্ট্রের পটভূমি ও রূপ রেখাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ঘ· রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শনের বিশ্বকোষ (প্রকাশিতব্য) ঙ· মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস (প্রকাশিতব্য)